যুবকের প্রেম

ও

অন্যান্য গল্প

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
১৩৪২

প্রকাশক
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
২৩, বি বেথুন রো,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ
"মানসী প্রেস"
৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকা[illegible]

মূল্য দেড় টাকা।

সূচী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম—২২শে মাঘ ১২৭৯ মৃত্যু—২১শে চৈত্র ৩৮

যুবকের প্রেম

—০:*:০—

বিবাহের পর তিনটি বৎসরও ঘুরিল না—মহেন্দ্র বিপত্নীক হইল।

মাত্র দুই বৎসর নয় মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির নাম ছিল চঞ্চলা। হিন্দুর মেয়ের চঞ্চলা নাম রাখা ভাল হয় নাই, কারণ, বধূ হইয়া তাহাকে পতিকুলে ধ্রুবতারার মত স্থির থাকিতে হইবে। ছেলেবেলায় সে বড় দুষ্ট ছিল বলিয়াই মা-বাপ তাহার চঞ্চলা নাম রাখিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা কি জানিতেন, তাহার জীবন-কুসুমটি ভাল করিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই, চপলা চঞ্চলার মতই সে আকাশের গায়ে লুকাইবে?

মহেন্দ্র তাহাদের জিলায় অবস্থিত মিশনরী কলেজ হইতে দুইবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

পড়াশুনায় মন তাহার কোন কালেই ছিল না। তাহার মন ছিল খেলায়—তাস পাশা খেলায় নয়—ক্রিকেট, ফুটবল, কুস্তী, জিম্‌ন্যাষ্টিক ইত্যাদিতে। কলেজের ফুটবল টীমের সেই ছিল কাপ্তেন, জিম্‌ন্যাষ্টিকের আখড়ায় সেই ছিল মাষ্টার। দেহে তাহার বিলক্ষণ বলও জন্মিয়াছিল।

পাস করিতে না পারিলেও, আর একটা জিনিস সে বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল—ইংরাজী ভাষা এবং আদবকায়দা। মিশনরী সাহেবগণের সহিত সর্ব্বদা মিশিবার ইহা ফল। খেলায় তাহার নিপুণতা ও দেহবলের জন্য সাহেবেরা তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন।

মহেন্দ্র বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র—পিতার মৃত্যুর পর সে-ই বাড়ীর কর্ত্তা হইয়াছিল। সংসারটি নিতান্ত ছোট ছিল না, সামান্য কিছু জমীজিরাৎ ছিল, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। সকলেই আশা করিয়াছিল, মহেন্দ্র মানুষ হইয়া উপার্জ্জন করিতে শিখিলে সংসারের কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও মহেন্দ্র মানুষ হইবার কোনও লক্ষণই দেখাইল না। তখন পাড়ার প্রবীণাগণ তাহার মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন—"ছেলের বিয়ে দাও; তা হ'লেই সংসারের দিকে টান হবে, টাকা রোজগারের চেষ্টা করবে।"—তাই, একুশ বৎসর বয়সে মা তাঁহার বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন,—চঞ্চলার বয়স তখন এগারো। বৎসরখানেক হইল, চঞ্চলা "ঘরবসত" করিতে আসিয়াছিল। প্রবীণাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া মহেন্দ্র ঘরেই বসিয়া রহিল, উপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা দেখিল না। শেষের এক বৎসর সে ত বউ লইয়াই

মাতিয়া ছিল। সেই বউ, কাল বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া মহেন্দ্রকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলে, সেই শোকে মহেন্দ্র কিছুদিন যেন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। সারা সকালবেলাটা মাথাটি নীচু করিয়া, উঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়ায়, সাত ডাকেও কেহ তাহার উত্তর পায় না। শ্রান্ত হইলে, তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে। "রান্না হয়ে গেছে, স্নান ক'রে এস"—বলিলে সে কথা কাণেই তোলে না। অবশেষে বিস্তর তাগিদে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসে, কিন্তু পাতে অর্দ্ধেক ভাত তরকারী ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যায়। বিকালে জিম্‌ন্যাষ্টিক বা ফুটবলের আড্ডা হইতে কেহ ডাকিতে আসিলে, তাহাকে ফিরাইয়া দেয়—যায় না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া বহুক্ষণ ঘুমায় না—এপাশ ওপাশ করে, মাঝে মাঝে কাঁদে। ইহা দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা গোপনে বলা-বলি করে—"আহা বড্ড দুজনে ভাব হয়েছিল কি না!"—আর, আঁচলে আপন আপন চক্ষু মুছে।

পাড়ার প্রবীণারা মহেন্দ্রের মাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, "শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে দাও—তা হ'লেই মন আবার ভাল হবে।" মা বলিতে লাগিলেন, "না দিদি, এখন আমি ওকে ও কথা বলতে পারব না। বড্ড শোকটা পেয়েছে—আর কিছুদিন যাক—একটু সামলে উঠুক আগে।"

২

ছয় মাস কাটিয়াছে। এখন মহেন্দ্র অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছে। আহারে আবার রুচি জন্মিয়াছে। কেহ হাসির কথা বলিলে, এখন সে পূর্ব্বের মতই হাসিয়া উঠে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ খেলিতে যায়। পূর্ব্বের মত সবই করে, কিন্তু কিছুতেই জীবনের সে স্বাদটুকু আর পায় না।

অবসর বুঝিয়া এক দিন মা তাহার নিকট পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মহেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—"না মা, ও কায আর করছিনে।"

মা বলিলেন, "পাগল ছেলে! এখন তোর বয়স কি? তোর বয়সের কত ছেলের প্রথম বিয়েই হয় না যে! তোর দ্বিগুণ বয়সের কত লোক, পরিবার মরবার পর দু'মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ে করেছে—তুই করবি নে কেন? ঐ ওপাড়ার চাটুয্যেদের মেঝকর্ত্তা—"

মহেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "যার যা প্রবৃত্তি হয়, সে তা করুক মা, আমার দ্বারা কিন্তু ও কাযটি হবে না।"

সে দিন এই পর্য্যন্ত। তাহার পর কোনও দিন মা, কোনও দিন মাসী, কোনও দিন পিসী, কোনও দিন খুড়ি-জেঠী-ঠান্‌দিদিরা এ বিষয়ে মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে মহেন্দ্র উত্যক্ত হইয়া স্থানত্যাগ করাই স্থির করিল। একদিন মাকে বলিল, "মা, আমি ভেবে দেখলাম, এ রকম ভাবে

ঘরে ব'সে থাকাটা ঠিক নয়। একটা কায-কর্ম্মের উপায় না হ'লে সংসারই বা চলবে কি ক'রে ? তাই মনে করছি, তুমি যদি মত কর তবে কলকাতায় গিয়ে একটা চাকরী বাকরীর চেষ্টা দেখি।"

এত দিনে ছেলের সুবুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তাই ত করা উচিত বাবা! লেখাপড়া শিখেছ, একটা চেষ্টা করলে অবশ্যই একটা ভাল কাযকর্ম্ম জোটাতে পারবে। তা কলকাতায় যাও—এস গিয়ে—তাতে আমার কোনও অমত নেই।"—মনে ভাবিলেন, কায-কর্ম্ম করিতে করিতেই ছেলের মন ভাল হইবে,—আবার বিবাহ করিতে রাজী হইবে,—সংসারটা বজায় থাকিবে।

সেই গ্রামের এক জন কায়স্থ কলিকাতায় লোহার ব্যবসায় করিয়া থাকেন। বড় কারবার। তিনি বাড়ী আসিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্র গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। তিনি শুনিয়া রাজী হইলেন; বলিলেন, "বেশ ত! আমার সঙ্গেই তুমি চল বাবাজী। আমার গদীতে থাকবে—খাবে দাবে—আর কায কর্ম্মের চেষ্টা ক'রে বেড়াবে। আমার আড়তেও অনেক লোক প্রতিপালিত হচ্ছে—কিন্তু তুমি ভাল লেখাপড়া শিখেছ, সে রকম সামান্য চাকরী ত তোমার উপযুক্ত হবে না, ভবিষ্যতেও তেমন কোনও উন্নতি নেই। কোনও একটা ভাল আপিস-টাপিসে ঢোকবার চেষ্টাই দেখতে হবে তোমায়। কারবারসূত্রে দু'চার জন বড়লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে, আমিও তোমার জন্যে চেষ্টা দেখবো।"

যথাদিনে মহেন্দ্র আম্রশাখাযুক্ত ঘট প্রণাম করিয়া, জননী প্রভৃতির পদধূলি লইল। মা, তাহার কপালে দধির ফোঁটা দিয়া, "চিরজীবী হও—রাজ-রাজেশ্বর হও"—বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। একটি ব্যাগে নিজ সামান্য বস্ত্রাদি, মৃতা পত্নীলিখিত খানকতক পুরাতন চিঠি এবং মাতৃদত্ত দশটি মাত্র টাকা লইয়া, মহেন্দ্র কলিকাতা যাত্রা করিল।

৩

মহেন্দ্র মফঃস্বলে প্রতিপালিত হইলেও, সে নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে নহে—কলিকাতা তাহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না. পিতার জীবনকালে তাঁহার সহিত কয়েকবার সে কলিকাতায় আসিয়া এক মাস দেড় মাস করিয়া থাকিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় পৌঁছিবার দুই দিন পরে সেই কায়স্থ বাবুটি মহেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন এবং কয়েক জন বড়লোকের নিকট তাহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "চেষ্টা করা যাবে। মাঝে মাঝে এসে খবর নিও।"

মহেন্দ্র দুই চারি দিন অন্তর তাঁহাদের বৈঠকখানায় গিয়া ধর্ণা দিতে লাগিল; সব দিন যে কর্ত্তা মহাশয়ের দেখা পাইত, তাহা নহে; দেখা পাইলেও, বিশেষ কোনও আশার বাক্য শুনিতে পাইত না। "বি-এটা পাস করা থাকিলে চট্ ক'রে একটা কিছু হয়ে যেতে

পারতো।—যা হোক, চেষ্টায় আছি, দু'চার জন লোককে বলেও রেখেছি, দেখি কি হয়।"—এইরূপ কথা শুনিয়াই ফিরিতে হইত।

আফিস অঞ্চলেও মহেন্দ্র ঘোরাঘুরি আরম্ভ করিল। সারাদিন ধূলায় রৌদ্রে ঘুরিয়া, শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া গদীতে ফিরিয়া আসিত৭ আহার করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিতে যাইত ; মৃতা পত্নীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িত। নির্জ্জন পাইলে ব্যাগ হইতে চঞ্চলার পত্রগুলি বাহির করিয়া পাঠ করিত ; পড়া শেষ করিয়া, সজল নয়নে সেগুলি আবার নেকড়ায় বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিত।

কলিকাতায় এইভাবে একমাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কায-কর্ম্মের কোনও কিনারা হইল না। এই সময় পূর্ব্বোক্ত বড়লোকগণের মধ্যে একজন প্রাতে দুই ঘণ্টা তাঁহার পুত্রকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য-পড়াইবার জন্য মাসিক দশ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র তাহা গ্রহণ করিল—তবু পকেট খরচটা ত চলিবে !

যখন দুই মাস কাটিয়া গেল, তখন মহেন্দ্র প্রায় হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ ভাবে বসিয়া বসিয়া সরকার মহাশয়ের অন্নধ্বংস করিতে তাহার মনে লজ্জাও হইতে লাগিল। ভাবিল, আর একটা মাস দেখিব—কিছু যদি না জুটে, তবে দেশে ফিরিয়া গিয়া, চাষবাস কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইবে।

কিন্তু সেটা তাহাকে করিতে হইল না—ভাগ্যদেবী তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং প্রসন্ন বদনে হাসিয়া, তাহার আশার সুসার করিবার জন্য এক অভাবনীয় ঘটনার সৃষ্টি করিলেন।

৪

সে দিন শনিবার ছিল, আফিসগুলি বেলা দুইটার সময় সব বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্র আর কি করে, গদীতে ফিরিয়া গিয়া জন্তুটির মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল, তার চেয়ে যাই, গড়ের মাঠে গিয়া গাছের ছায়ায় একটু শুইয়া থাকি। তাই সে করিল। রাস্তা হইতে অল্পদূরে, একটা খালি বেঞ্চি দেখিয়া তথায় গেল এবং গায়ের উড়ানীখানি খুলিয়া, গুটাইয়া সেটীকে উপাধান স্বরূপ করিয়া, বেঞ্চির উপর শয়ন করিল। ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল, আরামে মহেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঘণ্টা দুই এই ভাবে নিদ্রা যাইবার পর, সে জাগিয়া উঠিল। শরীরে আবার বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিল। রৌদ্র তখন পড়িয়া গিয়াছে। বাসায় ফিরিবার অভিপ্রায়ে, উঠিয়া ধীরে ধীরে রাস্তার উপর আসিল। পথে তখন অনেক বায়ুসেবনকারী বহির্গত হইয়াছে।

কিয়দ্দূর পথ আসিয়া, মহেন্দ্র দূরে একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। দেখিল কেল্লার দিক হইতে একখানা বগীগাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই গাড়ীকে থামাইবার জন্য রাস্তার লোক হো-হা করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতেছে—কিন্তু ঘোড়া নিকটে আসিবামাত্র তাহারা সরিয়া দাঁড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী মোড় ঘুরিয়া, মহেন্দ্র যে রাস্তায় ছিল, সেই রাস্তা লইবার চেষ্টায় কোণের ল্যাইটপোষ্টে ধাক্কা খাইল। পশ্চাতে যে সহিস দাঁড়াইয়া

ছিল, সে ছিট্‌কাইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল; গাড়ী বিদ্যুদ্‌বেগে মহেন্দ্রের দিকে আসিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হইল, এক জন অল্পবয়স্কা শ্বেতকায়া মহিলা মধ্যস্থলে বসিয়া, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি শিশু—একটি বালক, একটি বালিকা। তিনি নিজেই গাড়ী হাঁকাইতেছিলেন, অশ্বের ছিন্ন বল্‌গা তখনও তাঁহার হাতেই রহিয়াছে।

মহেন্দ্র যেখানে ছিল, সে স্থানের কাছাকাছি চার পাচ জন ইংরাজ ভদ্রলোক বেড়াইতেছিলেন। খিদিরপুর ডকের বহুসংখ্যক কুলি সেই সময় উত্তর দিক হইতে সেই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল, সাহেবেরা লম্ফ দিয়া সেই সব কুলির মধ্যে পড়িয়া, ছড়ি উঁচাইয়া ধমক দিয়া, তাহাদিগকে আনিয়া, পথের প্রস্থভাগ জুড়িয়া তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া দিলেন, এবং নিজেরা বিপদের স্থান—মধ্যভাগ জুড়িয়া রহিলেন। তাঁহারা চীৎকার করিতে করিতে ছড়ি আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কুলিরাও হল্লা করিতে লাগিল। মহেন্দ্র স্বেচ্ছায় এই কুলিদের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

অশ্ব কাছাকাছি আসিয়া, পথ এরূপ ভাবে অবরুদ্ধ দেখিয়া সহসা ফিরিয়া ময়দানের দিকে মুখ করিল, এবং নিমেষ মধ্যে খানা পার হইয়া, ময়দানে প্রবেশ করিয়া ছুটিতে লাগিল। মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজ গলা হইতে চাদরখানা নামাইয়া, তাহার উভয় প্রান্ত একত্রে গাঁইট দিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিয়দ্দূর প্রাণপণে ছুটিয়া অশ্বের নাগাল পাইয়া, সেই চাদরের ফাঁস তাহার গলায় লাগাইয়া বিপুল বলে তাহা টানিতে টানিতে আড় হইয়া ছুটিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। মহেন্দ্রের এই সাহস ও কৌশল দেখিয়া, "ব্রাভো ইয়ংম্যান—হোল্ড অন্" (সাবাস যুবক, ধরিয়া থাক) বলিয়া তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন। অশ্বের গতিবেগ প্রতি মুহূর্ত্তে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে সাহেবেরা আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেই চাদর দুই তিন জনে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কিয়দ্দূর গিয়াই অশ্ব পরাজয় স্বীকার করিল—সে দাঁড়াইল।

দুই জন সাহেব তখন মেমসাহেব ও শিশুদ্বয়কে বগী হইতে নামাইলেন। মেমসাহেবের মুখ শাকের বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। দাঁড়াইতে পারিলেন না। সেইখানে ভিজা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন। কথা কহিবার শক্তি নাই যে কাহাকেও ধন্যবাদ দিবেন। শিশু দুইটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মেমসাহেবের মূর্চ্ছার উপক্রম দেখা গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এক সাহেবের পকেটে ব্র্যাণ্ডি-ভরা ফ্ল্যাস্ক ছিল। তিনি সেটি বাহির করিয়া, মেমসাহেবের মুখে ধরিলেন। মেমসাহেব ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা পান করিয়া ফেলিলেন।

সাহেবেরা কেহ মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিলেন, কেহ তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, সকলেই তাহাকে অজস্র প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেব একটু চাঙ্গা হইলে, তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি কেল্লায় থাকেন, মেজর গ্রীণের পত্নী। শিশু দুইটি তাঁহার

নিজস্ব নহে-কর্ণেল হ্যামিল্টনের সন্তান—তিনি তাহাদিগকে লইয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সহিসটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী-ঘোড়া তাহায় জিম্মায় রাখিয়া, সাহেবেরা বিবি গ্রীণ্ ও শিশুদ্বয়কে রাস্তার উপর লইয়া আসিয়া একটা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া দিলেন। বিবি, সাহেবদিগকে ও মহেন্দ্রকে মধুর ভাষায় ধন্যবাদ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবু, তুমি আমায় কেল্লায় পৌঁছাইয়া দিবে চল।"

মহেন্দ্র কোচবাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, বিবি বলিলেন, "না না—তুমি ভিতরে আসিয়া বস।" মহেন্দ্র তাহাই করিল, গাড়ী কেল্লা অভিমুখে ছুটিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া,বিবি গ্রীণ মহেন্দ্রকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া বলিলেন, "আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে এক স্থূলকায় বর্ষীয়ান্ সাহেককে সঙ্গে লইয়া বিবি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,"জন্, এই বাবু আমার জীবনদাতা।" মহেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আমার স্বামী, মেজর গ্রীণ।"

ইঁহারা প্রবেশ করিতেই মহেন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। মেজর সাহেবকে সেলাম করিল। সাহেব মহেন্দ্রের করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইলেন। এক সোফার উপর নিজ পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার নাম ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র উত্তর দিতে লাগিল। সাহেব বলিলেন, "বাঃ, তুমি ত বেশ ইংরাজী বল, বাবু! তুমি একজন সুশিক্ষিত লোক।"

বেহারার মুখে সংবাদ পাইয়া, কর্ণেল হ্যামিল্টনও এই সময় আসিয়া পড়িলেন, এবং মহেন্দ্রের প্রতি সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল উভয় সাহেবে বসিয়া, মহেন্দ্রের সহিত নানা কথোপকথন করিলেন, তাহার পর উভয় সাহেব উঠিয়া গিয়া পরামর্শ করিলেন। পরে কর্ণেল সাহেব মহেন্দ্রকে আসিয়া বলিলেন, "বাবু, তুমি আজ আমাদের যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমাদের আজীবন স্মরণ থাকিবে। তোমার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস অত্যন্ত প্রশংসার্হ। আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে যদি আমরা সামান্য কিছু উপহার দিই, তাহাতে তুমি বিরক্ত হইবে কি?"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে একখানি একশো টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

মহেন্দ্র নোটখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া, সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কোনও উপহার বা পুরস্কারের আশায় ত এ কার্য্য করি নাই। প্রত্যেক ভদ্রলোকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিয়াছি মাত্র। টাকা না লইবার অপরাধ আপনারা গ্রহণ না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সাহেব দুইজন আবার কি বলাবলি করিলেন। তাহার পর মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি চাকরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসিয়াছ বলিলে; কোনও স্থানে কোন আশা পাইয়াছ কি?"

"না সাহেব, এ পর্য্যন্ত পাই নাই।"

"আমাদের আফিসে একটি চাকটি চাকরী খালি আছে। বেতন একশ টাকা, সেটি পাইলে তুমি খুসী হও?"

"হাঁ সাহেব—সেটি পাইলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান্ মনে করিব।"

"বেশ! কাল তুমি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিও এবং বেলা একটার সময় আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিও।"

"নিশ্চয় আসিব। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"কিছুই না—কিছুই না, তবে ঐ কথা ঠিক রহিল। আমরা এখন ক্লাবে চলিলাম। (স্ত্রীর প্রতি) এল্‌সি, বাবুকে একটু চা খাওয়াইবে না?"

বিবি গ্রীণ বলিলেন, "চা আনিতে হুকুম দিয়াছি। তোমরা চা খাইয়া যাইবে না?"

মেজর সাহেব বলিলেন, "না প্রিয়তমে, আজ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—আমরা ক্লাবে গিয়াই যাহা হয় পান করিব।"—বলিয়া তিনি কর্ণেল সাহেব সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

'যাহা হয়' কথাটির অর্থ বুঝিয়া, বিবি গ্রীণ আপন মনে একটু হাসিলেন। চায়ের অপেক্ষায় মহেন্দ্রকে নিকটে বসাইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

পরদিন দরখাস্ত লইয়া কেল্লার আফিসে গিয়া মেজর সাহেবের সঙ্গে মহেন্দ্র সাক্ষাৎ করিল। মেজর সাহেব যথাস্থানে লইয়া গিয়া,

সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত মঞ্জুর করাইয়া,নিয়োগপত্র সহি করাইয়া দিলেন। আগামী কল্য হইতেই তাহাকে কার্য্য করিতে হইবে।

বাসায় ফিরিবার পথে, একটা পোষ্ট আফিসে দাঁড়াইয়া, মহেন্দ্র পোষ্টকার্ডে জননীকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

মহেন্দ্রের আশ্রয় দাতা আড়তদার সেই কায়স্থবাবুটি এ সংবাদে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মহেন্দ্র সঙ্কুচিত ভাবে তাঁহাকে বলিল, "গোটাকতক টাকা পেলে আফিস যাবার জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় তৈরী করাতাম। মাইনে পেয়ে শোধ করতাম।"

কায়স্থবাবুটি তৎক্ষণাৎ তাহার আবশ্যকমত টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পরদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে, ধর্ম্মতলার একটা ভাল দর্জ্জির দোকানে মহেন্দ্র দুইটা ইংরাজী স্যুট ফরমাস দিয়া আসিল।

যেদিন চাকরী হইল, সেদিন রাত্রে বাসায় শয়ন করিয়া, স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিল বুকে করিয়া মহেন্দ্র অনেক অশ্রুবর্ষণ করিল।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়া মহেন্দ্র সেই ছেলে পড়ানো চাকরীটি ছাড়িয়া দিল, কায়স্থ বাবুর ঋণ পরিশোধ করিল; একটা মেসের বাসা স্থির করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল, আরও কিছু কাপড় চোপড় ফরমাস দিল এবং মাকে দশটি টাকা মণিঅর্ডার করিল।

মহেন্দ্রের চালচলন, ইংরাজী কথ্য-ভাষাজ্ঞান ও কর্ম্মপটুতায় সাহেবেরা তাহার উপর বেশ সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন মেজর সাহেব বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চা-পানার্থে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। বিবি গ্রীণ সে দিনও তাহাকে সমাদরে ও মিষ্টবাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

চা-পানান্তে মেজর সাহেব বারান্দায় চেয়ার বাহির করাইয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বসিলেন, বিবি গ্রীণ বেড়াইতে যাইবার সাজসজ্জা করিবার জন্য ভিতরে গেলেন। মেজর সাহেব বলিলেন, "মোহেন্, আফিস হইতে বাড়ী গিয়া তুমি কি কর?"

আফিসে এখন সাহেবেরা মহেন্দ্রের নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে "মোহেন্" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। মহেন্দ্র উত্তর দিল, "চা পান করিয়া বাসাতেই থাকি, কিছু পড়ি-টড়ি, কোনও দিন থিয়েটার কিম্বা বায়স্কোপে যাই।"

"বেড়াইতে যাও না?"

"এখান হইতে বাসায় ফিরিতেই আমার বেড়ানো হইয়া যায়।"

"দেখ, আমি উর্দ্দু পাশ করিয়াছি; কিন্তু বাঙ্গলা এখনও পাশ করি নাই। বাঙ্গলা পাশ করাও আমার আবশ্যক। আমার এক জন শিক্ষক প্রয়োজন, তাহাকে আমি মাসে কুড়ি টাকা করিয়া মাহিনা দিব—অধিক দিতে পারিব না। তুমি আমায় পড়াইবে? আফিসের পর এক ঘণ্টা—এই ধর পাঁচটা হইতে ছয়টা।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেতনের জন্য কিছুমাত্র আসে যায় না। আপনার অনুগ্রহেই আমি চাকরীটি পাইয়াছি, অতি আহ্লাদের সহিত আমি আপনাকে বাঙ্গলা শিখাইতে প্রস্তুত আছি।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ কথা। কত দিনে আমি বাঙ্গলা শিখিতে পারিব, বল দেখি?"

"আপনি কি পরিমাণ শিখিতে চান, তাহা না জানিলে বলা শক্ত।"

"পরীক্ষা পাস করার মত—বেশী শিখিয়া কি করিব? আমি অন্যান্য মিলিটারী অফিসারগণের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলা পাস করিতে ছয় মাস যথেষ্ট। কাল হইতেই আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক, কি বল?"

"বেশ ত! কাল আমি আফিসের পরেই আসিব। একখানি বর্ণপরিচয় বহি আপনার জন্য কিনিয়া আনিব কি?"

"আনিও।" বলিয়া পাৎলুনের পকেট হইতে সাহেব একটি টাকা বাহির করিয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে ধরিলেন।

মহেন্দ্র বলিল, "টাকা রাখুন। ঐ বহির দাম পাঁচ পয়সা মাত্র, আমি কিনিয়া আনিব এখন।"

সাহেব টাকাটি পকেটে ফেলিয়া, একটি দুয়ানি বাহির করিয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন।

এই সময়ে মেম সাহেব বাহির হইয়া আসিলেন; সহিস টমটম-খানি আনিয়া হাজির করিল। মহেন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সাহেব সস্ত্রীক টমটমে গিয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্রও ইঁহাদের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছিল। ঘোড়ার প্রতি চাহিয়া বলিল, "এটা ত আপনার সে ঘোড়া নয়।"

সাহেব বলিলেন, "না। সেটাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। এটা নূতন কিনিয়াছি, এ বেশ ঠাণ্ডা।"—বলিয়া হস্তসঙ্কেতে বিদায় জ্ঞাপন করিয়া তিনি টমটম হাঁকাইয়া দিলেন।

পরদিন আফিসের পর মহেন্দ্র সোজা মেজর সাহেবের কুঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বারান্দায় বিবি গ্রীণ দাঁড়াইয়া ছিলেন;

তিনি হাসিয়া বলিলেন, “আমার স্বামীকে বাঙ্গলা পড়াইতে আসিয়াছেন বুঝি? কিন্তু আপনার ছাত্র ত পলাতক!”

“তিনি কোথায় গিয়াছেন?”

“ভয় নাই। একটু পরেই আসিবেন। তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছেন, ততক্ষণ আপনাকে চা দিতে। ভিতরে আসুন; চা আমাদের প্রস্তুত।”—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

চা ঢালিয়া, রুটী-মাখনের প্লেটটা মহেন্দ্রের দিকে সরাইয়া দিয়া, টেবিলের উপরে রক্ষিত বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ বইখানি তিনি কৌতূহলবশতঃ তুলিয়া লইলেন। সেখানি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ খান থেকে আরম্ভ করিতে হয়?”

অ-আর পাতা দেখাইয়া মহেন্দ্র বলিল, “এইখান থেকে। এইগুলি স্বরবর্ণ—ভাওয়েল্স্,—আর, এই পাতায় এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ—কনসোনেণ্টস্।”

চা-পান করিতে করিতে মেমসাহেব অক্ষরগুলির দিকে চাহিতে লাগিলেন। “এগুলির চেহারা ত ভারি অদ্ভুত! দেখিলে বাস্তবিক হাসি পায়। কোন্‌টির কি নাম?”

মহেন্দ্র বলিল, “এইটি অ।”

“এক মুহূর্ত্ত থামুন।”—বলিয়া মেমসাহেব তাঁহার পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি সোণার পেন্সিল বাহির করিয়া অক্ষরতলে লিখিলেন—“Awe”

“এটি?”

“আ।”

মেমসাহেব তাহার তলায় লিখিলেন—"Ah !"—এইরূপে স্বরবর্ণের প্রত্যেক অক্ষরের নিম্নে সেগুলির উচ্চারণ লিখিয়া লইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মেজর গ্রীণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেমসাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ব্যাড্ বয় ! মুন্সীজী কতক্ষণ আসিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহা হউক তুমি যে সময় নষ্ট করিলে, তাহাতে কোনও ক্ষতি হইবে না। তোমার কার্য্য অনেকটা আমি অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছি।"—বলিয়া তিনি অক্ষরগুলি দেখাইয়া উচ্চারণও পড়িতে লাগিলেন।

মেজর সাহেবের চা-পান শেষ হইতে প্রায় ছয়টা বাজিল। পকেট হইতে ঘড়ী খুলিয়া দেখিয়া স্ত্রীর প্রতি বলিলেন, "আজ আর আমার পড়িবার সময় কৈ ? অক্ষরগুলির উচ্চারণ তুমি ত লিখিয়াই রাখিয়াছ, কাল সকালে ওগুলা আমি অভ্যাস করিব এখন। চল, এবার হাওয়া খাইতে যাওয়া যাক। মোহেন্, কাল আসিয়া তুমি দেখিবে, ঐ সমস্ত অক্ষর আমার চেনা হইয়া গিয়াছে, আমি নূতন পাঠ লইব।" -- বলিয়া সহাস্যে মহেন্দ্রকে বিদায় দিয়া তিনি "সস্ত্রীক শকটারোহণে" হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন।

পরদিন মহেন্দ্র সাহেবের কুঠিতে গিয়া দেখিল, সাহেব আছেন। তিনি মহেন্দ্রকে বসাইয়া বলিলেন, "ওহে দেখ, তোমাদের বাঙ্গলা অক্ষরগুলা ড্যাম ডিফিকল্ট ! উচ্চারণ অতি বদ্। আজ আমি সেগুলা অভ্যাস করিবার বেশী সময় পাই নাই, কাল করিব; করিয়া নূতন পাঠ লইব। আজ তুমি এক পেয়ালা চা খাইয়া যাও।"

চা-পানের পর মেমসাহেব প্রথমভাগখানি আনয়া স্বামীর প্রতি

চাহিয়া বলিলেন, "এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলার উচ্চারণও টুকিয়া লও না, জন। স্বরবর্ণগুলা চেনা শেষ করিয়া যদি সময় পাও, ব্যঞ্জনবর্ণ গুলাও কতটা চিনিয়া রাখিতে পারিবে।"

সাহেব বলিলেন, "বেশ বুদ্ধি করিয়াছ। ওগুলা তুমিই লিখিয়া রাখ, প্রিয়তমে।"

মেমসাহেব একটি একটি করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু "ত" লইয়া বড় বিপদ হইল। তিনি "ত" কোনমতেই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না—"ট" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া সাহেব হাসিয়াই আকুল।

৬

লেখাপড়া এই ভাবেই চলিতে লাগিল। সাহেব গৃহে উপস্থিত থাকিলে, দুই দিন ভাঁড়াইয়া এক দিন পড়েন। যেদিন মহেন্দ্র আসিবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করেন, সে দিন স্ত্রীকে বলিয়া যান, নূতন পড়াটা তুমিই শিখিয়া লইও, কাল সকালে তোমার কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।"

মেমসাহেব এ দিকে দ্রুতগতি শিখিয়া ফেলিতেছেন। এক মাস হইয়া গেল, সাহেবের 'সাধু পূজা'ই ভাল করিয়া আয়ত্ত হইল না। কিন্তু মেমসাহেবের প্রথম ভাগ প্রায় শেষ— রাখালের গল্প হইতেছে। তাই কি পূরা সময়টা তিনি পড়েন? দুজনে বসিয়া কত গল্প হয় —কত হাসি-তামাসা—কত রঙ্গ-ব্যঙ্গ।

এক দিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে মেমসাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের দেশে, শিক্ষকেরা ছাত্র বা ছাত্রীর গুরুজনস্বরূপ গণ্য—নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"গুরুজনের সামনে তাঁদের নাম করিতে নাই, তুমি বলিয়াছ। কিন্তু আমি যে তোমার নাম করিয়া ডাকি—মিষ্টার মোহেন্ বলি, এটা ত উচিত হইতেছে না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তাতে আর দোষ কি? তুমি ত আর বাঙ্গালীর মেয়ে নও।"

"আর, তুমি আমায় মিসেস্ গ্রীণ বল, সেটাও ভাল শোনায় না। আমার ইচ্ছা, আমি তোমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিব—আর তুমি আমায় এল্‌সি বলিয়া ডাকিবে। সে কি ভাল হইবে না?"

"তুমি আমায় গুরুজী বলিয়া ডাকিলে কোনও ক্ষতি হইবে না—কিন্তু আমি তোমায় এল্‌সি বলিয়া ডাকিলে তোমার স্বামী কি সেটা পছন্দ করিবেন?"—বলিয়া মহেন্দ্র একটু হাসিল।

মেমসাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—তা বটে, তিনি হয়ত মনে করিবেন, তোমাতে আমাতে প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। রাগ করিতে পারেন বটে। তবে কায নাই—যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক। বুড়াকে চটাইয়া লাভ কি?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

এইরূপ রঙ বেরঙের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে হইতে লাগিল রঙ্গ

ক্রমে চড়িতে লাগিল। তবে সাহেব উপস্থিত থাকিলে বাজে কথা একটিও হইত না।

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে সাহেবের প্রথম ভাগ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু মেমসাহেব বোধোদয় ধরিয়াছেন।

এমন সময় সরকারী কার্য্যে মেজর সাহেবকে করাচী যাইবার আদেশ হইল। দুই সপ্তাহকাল সেখানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে। সেদিন পড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিবার সময় মহেন্দ্র বলিল, "তা হলে, আপনি ফিরিয়া আসিলে আবার আমি আসিব।"

মেমসাহেব বলিলেন, "আমি বুঝি পড়িব না? দুই সপ্তাহ না পড়িলে আমি সব ভুলিয়া যাইব যে!"

সাহেব বলিলেন, "তুমি যেমন আসিতেছ, তেমনি আসিও মোহেন্। মেমসাহেবকে পড়াইও।"

মহেন্দ্র সম্মত হইয়া বাসায় চলিয়া গেল।

৭

মেজর সাহেবের অনুপস্থিতিসত্ত্বেও মহেন্দ্র তাঁহার মেমকে প্রতিদিন পাঁচটা বাজিলেই পড়াইতে যায়। পড়ানো শেষ হইতে প্রথম দুই দিন ছয়টা স্থানে সাতটা বাজিয়াছিল, তৃতীয় দিন একেবারে আটটা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর পানে চাহিয়া বিবি গ্রীণ বলিলেন, "উঃ—আটটা! অনেক দেরী হইয়া গেছে ত! মোহেন, তুমি, কেন আমার সঙ্গেই আজ ডিনার খাইয়া যাও না।"

মহেন্দ্র বলিল, "বেশ ত—ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

"আচ্ছা, তুমি তবে ততক্ষণ হাত-মুখ ধুইয়া লও, নীচেই গোসলখানা আছে। আমিও উপরে গিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আসি। সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারে বসিব।"—বলিয়া তিনি বেয়ারাকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "সাহেবকা ওয়াস্তে গোসলখানা ঠিক করো।" বেয়ারা চলিয়া গেল।

কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে সে নিম্নতলে একটি কামরায় লইয়া গেল। এটি শয়নকক্ষ, কিন্তু অব্যবহৃত বলিয়া মনে হইল। সেই কক্ষের সংলগ্ন গোসলখানায়, একখানি নূতন সাবান, ধোয়া তোয়ালে ও জল রহিয়াছে। মহেন্দ্র শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া, সিগারেট মুখে করিয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, এল্‌সি তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়া আছে। তাহার অঙ্গে কালো সিল্কের সান্ধ্য পরিচ্ছদ, পাউডার-চর্চ্চিত অর্দ্ধনগ্ন শুভ্র বক্ষের উপর একটি মুক্তাহার দুলিতেছে! এল্‌সি বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে।

মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, "কি পড়া হইতেছে?"

"এ একখানি নভেল, নূতন বাহির হইয়াছে। তুমি বোধ হয় এখনও এখানি পড় নাই?"—বলিয়া মহেন্দ্রর হস্তে এল্‌সি পুস্তকখানি দিল।

মহেন্দ্র বহিখানির সদর পৃষ্ঠা দেখিয়া বলিল, "না, এখানি পড়ি

নাই। তবে এই লেখকের অন্য কয়েকখানি উপন্যাস আমি পড়িয়াছি।"

এল্‌সি বলিল, "এখানি খাসা বই। আমার পড়া হইলে তোমায় দিব এখন—পড়িয়া দেখিও, বেশ মজা আছে। আচ্ছা মোহেন্, তোমাদের বাঙ্গলা ভাষায় নভেল আছে?"

"হ্যাঁ,—আছে বৈ কি, অনেক আছে।"

"সে-সব নভেল কি রকম? তুমি ত ইংরাজি নভেল অনেক পড়িয়াছ, বাঙ্গলা নভেলও কি সেই ধরণের?"

"অনেকটা সেই ধরণের বৈ কি।"

"তাতে লভ মেকিং (প্রেমলীলা) আছে?"

"তা আছে বৈ কি! প্রেমলীলা ছাড়া কি আর নভেল হয়?"

"সে ত নিশ্চয়। বাঙ্গলা নভেলে নায়িকারা সব কি রকম হয়?"

"যা হওয়া উচিত—খুব সুন্দরী হয়। তবে বয়সটা তাদের কিছু কম হয়। ইংরাজী নভেলে যেমন নায়িকারা হয় ১৮।১৯, বাঙ্গলা নভেলে তেমনই ১৩।১৪ বছরের হয়।"

এল্‌সি হাসিয়া বলিল, "আমার বয়সও কিন্তু ১৯ বৎসর। আমি স্বচ্ছন্দে ইংরাজী উপন্যাসের নায়িকা হইতে পারি—কি বল? কিন্তু বাঙ্গলা উপন্যাসের ত পারি না। আচ্ছা, এ দেশের ঐ সব ছোট ছোট মেয়েরা প্রেম করিতে জানে?"

"আমাদের গরম দেশ কি না। অল্পবয়সেই আমরা ও বিষয়ে বেশ পরিপক্ক হইয়া উঠি।"

"কার সঙ্গে ঐ সব মেয়েরা প্রেম করে ?"

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখনও বাঙ্গলা উপন্যাসে "আর্টের" যুগ—পরকীয়া প্রেমের যুগ—তেমন "নির্ভীক"ভাবে আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং মহেন্দ্র বলিল, "তারা প্রেম করে স্বামীর সঙ্গে—অথবা যার সঙ্গে শেষে বিবাহ হইবে, তার সঙ্গে।"

শুনিয়া এল্‌সি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সে ত নিতান্ত সেকেলে ফ্যাশান ! স্বামী বা হবু স্বামীর সঙ্গে প্রেমে আবার কোনও মজা আছে না কি ?"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আমাদের সাহিত্য এখনও তত মজাদার হইয়া উঠে নাই।"

এই সময় বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, "খানা টেবিল পর।"

উভয়ে উঠিয়া খানা-কামরায় গেল। টেবিলটি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। দুইটি ফুলদানিস্থ পুষ্পগুচ্ছের মাঝে বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতে লাগিল।

দুই কোর্স শেষ হইবার পর, পরিবেষণকারী "বয়" রক্তবর্ণ তরল পদার্থপূর্ণ ডিক্যাণ্টার আনিয়া মেমসাহেবের 'ওয়াইন' গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিল। এল্‌সি মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে একটু ক্লারেট দিবে কি ? না হুইস্কি ? আমরা স্বামী কিন্তু হুইস্কিই পছন্দ করেন "

মহেন্দ্র হসিয়া বলিল, "আমি ও সব কখনও পান করি নাই। আমি মিশনরীদের সহবাসে মানুষ, তাঁরা সুরাপান করাকে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন।"

এল্‌সি হাসিয়া বলিল, "মিশনরীরা ঐ রকম অদ্ভুত জীবই বটে। তা, তুমি কখনও পোর্টও খাও নাই? পোর্ট ত অনেকে ডাক্তারের উপদেশে পান করে।"

মহেন্দ্র বলিল, "হাঁা, পোর্ট আমি পান করিয়াছি বটে।"

এল্‌সি হুকুম করিল, "বয়, সাহেবকো পোর্ট সরাপ।"

বেয়ারা সাইডবোর্ড হইতে পোর্টের বোতল ও পোর্টগ্লাস লইয়া আসিল। মহেন্দ্রের পার্শ্বস্থ ক্লারেট গ্লাসটি সরাইয়া, সেখানে পোর্ট-গ্লাস রাখিয়া উহা পূর্ণ করিয়া দিল।

তখন "উপন্যাসে প্রেমতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। উভয়ের গ্লাস খালি হইবামাত্র বয় তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। তৃতীয় গ্লাসের মাঝামাঝি পৌছিয়া মহেন্দ্রের দেহ মনে একটা অপূর্ব্ব পুলকসঞ্চার হইল। তাহার কথাবার্ত্তা আরও সরস হইয়া উঠিল—কথায় কথায় উভয়ের হাসির ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের বিশেষ কোনও রংদার কথা শুনিয়া "Naughty boy!" (দুষ্ট বালক) বলিয়া, হাসিতে হাসিতে এল্‌সি তাহার বাহুতে বা পিঠে থাবড়া মারিতে লাগিল। গোলাপী চোখে, এল্‌সির পানে চাহিয়া মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, এ যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা—এমন সুন্দরী সুরসিকা রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ।

আহার শেষ হইলে উভয়ে ড্রইং রুমে গিয়া বসিল।

সেদিন মহেন্দ্র যখন বাসায় ফিরিল, রাত্রি তখন প্রায় একটা।

৮

পরদিন রবিবার ছিল। বেলা সাতটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মহেন্দ্র শয্যায় পড়িয়া গত রাত্রির ঘটনাগুলি স্মরণ করিতে লাগিল।

সব কথা স্মরণ করিয়া নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—"ছি ছি!—এ আমি কি করিলাম! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়ছিলাম, আজীবন আমার মৃতা পত্নীর পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া সেই ভালবাসায় তন্ময় হইয়া থাকিব, তাহাকে ধ্যান করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দিব, একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব—সে প্রতিজ্ঞা আমার কোথায় রহিল? ছি ছি—আমি কি নীচ! কি দুর্ব্বল! কি অপদার্থ! আমি ত মনুষ্য নামের অযোগ্য। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

সারাদিন মহেন্দ্র বিষণ্ণ বদনে বাসায় বসিয়া কাটাইল। যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ত হইয়াই গিয়াছে—এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই সে চিন্তা করিতেছিল। একবার বাক্স খুলিয়া স্ত্রীর চিঠির বাণ্ডিলটি বাহির করিল। মনে হইল, চিঠিগুলি যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"অপবিত্র পশু! ঐ কলঙ্কিত হস্তে আমাদের স্পর্শ করিবার অধিকার আর তোমার নাই!" মহেন্দ্রের হস্তে সেই চিঠির বাণ্ডিল যেন জলন্ত অঙ্গারের মত অনুভূত হইল। সে উহা বাক্সে ফেলিয়া, বাক্স বন্ধ করিল।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়াও সে অনেকক্ষণ এই বিষয়ে চিন্তা করিল। অবশেষে স্থির করিল, জোর করিয়া, শাসন করিয়া, অবাধ্য মন-মাতঙ্গকে ও পথ হইতে ফিরাইতে হইবে। প্রলোভনের পথে আর পদার্পণ করা উচিত নয়। মেজর সাহেব যতদিন না ফেরেন, ততদিন আর তাঁহার বাড়ীতে সে যাইবে না—তিনি ফিরিলেও আর যাইবে না—তাঁহাকে বাঙ্গলা পড়ানো পরিত্যাগ করাই—সে স্থিরসঙ্কল্প করিল। নেশার ঝোঁকে একবার বিপথে পা দিয়াছে বলিয়া আজীবন যে সেই পথেই চলিতে হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই—আবার চেষ্টা করিয়া, সংযম-সাধনা করিয়া দৃঢ়চিত্তে সুপথেই নিজেকে চালনা করিতে হইবে।

পরদিন সোমবারে মহেন্দ্র তাহার আফিসে গেল। পূর্ব্ব হইতে সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, আজ পাঁচটা বাজিলেই সটান্ সে বাসার পথ ধরিবে—সাহেবের কুঠীর ধারে কাছেও যাইবে না। কিন্তু তিনটার পর এ বিষয়ে তাহার মনে একটু দ্বিধা প্রবেশ করিল। এরূপভাবে না বলিয়া কহিয়া পলায়ন করা কি নিতান্ত অভদ্রতা হইবে না? তার চেয়ে, যথাসময়ে গিয়া মেমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, কোনও একটা ওজর দেখাইয়া বিদায় লওয়াই ভাল। ভদ্রতাও রক্ষা হইবে—সকল দিক বজায়ও থাকিবে; কারণ, মহেন্দ্রের সঙ্কল্প এখন স্থির—এল্‌সির মোহজালে আর কিছুতেই সে নিজেকে জড়াইতে দিবে না।

ক্রমে, "ভদ্রতা রক্ষার" জন্য মহেন্দ্রের মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ঘন ঘন ঘড়ির পানে চাহিতে লাগিল, কতক্ষণে পাঁচটা

বাজে! অবশেষে পাঁচটা বাজিল। মহেন্দ্র কলম্ ফেলিয়া, কাগজপত্র গুছাইয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া, হ্যাট্ ও ছড়ি হস্তে আফিস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মেজর সাহেবের কুঠীর নিকট গিয়া দেখিল, এল্‌সি বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মহেন্দ্র হ্যাট্ তুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। বারান্দায় উঠিতেই, এল্‌সি অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, "ওয়েল মোহেন্, নটি বয়!—কাল তুমি আস নাই কেন বল ত? আমি তোমার উপর ভা—রি রাগ করিয়াছি!"

মহেন্দ্র বলিল, "কাল যে রবিবার ছিল।"

"হ'লই বা রবিবার! তুমি ত জান, আমার স্বামী এখানে নাই, আমি একলাটি রহিয়াছি। নাই বা পড়িলাম—দু'জনে বসিয়া গল্পে-সল্পে আমোদে সন্ধ্যাটা ত কাটানো যাইত! কাল বিকালে তোমার কোথাও কোন কায ছিল বুঝি?"

"না, কায এমন বিশেষ কিছুই না।"

"আচ্ছা এখন চা খাইবে চল। আজ আর পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না। চা খাইয়া, চল, দু'জনে ময়দানে একটু বেড়াইয়া আসা যাউক।"

৯

মহেন্দ্রের 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞা,' 'স্থির-সঙ্কল্প,' 'সংযম-সাধনা,' কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার আর খোঁজ নাই। দিনের পর দিন, পরস্পরের নেশায় দু'জনে মসগুল হইয়া রহিল।

সেদিন বিকালে মহেন্দ্র মেমসাহেবকে "পড়াইতে" গিয়া দেখিল, সে ম্লানমুখে বসিয়া আছে, টেবিলের উপর একখানা হল্‌দে খাম। এল্‌সি বলিল, "মোহেন্‌, টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কাল প্রাতে আমার স্বামী আসিয়া পৌঁছিবেন।"—বলিয়া টেলিগ্রামখানি মহেন্দ্রের দিকে ঠেলিয়া দিল। মহেন্দ্র সেখানি পড়িয়া, বিষণ্ণবদনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

এল্‌সি বলিল, "দেখ মোহেন্‌, এখন হইতে আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে চলিতে হইবে। শুধু, আমার স্বামী ফিরিয়া আসিতেছেন বলিয়া নয়—তোমায় আমায় লইয়া আমাদের সমাজেও একটু কাণাঘুসা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, একজন নেটিভের সঙ্গে অত মেশামিশি কি জন্য?"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে কি এখন হইতে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ছিন্ন হইবে, এল্‌সি? তাহা হইলে কেমন করিয়া আমি বাঁচিব, প্রিয়তমে?"

"তাহা হইলে কি আমিই বাঁচিব? না প্রিয়তমে, সে হইতেই পারে না। তুমি পূর্ব্বে যেমন আমার স্বামীকে রোজ পড়াইতে আসিতে, পড়াইয়া চলিয়া যাইতে, সেইরূপ করিবে। তবু চোখের

দেখা ত হইবে। যাহাতে মাঝে মাঝে দুই এক ঘণ্টা করিয়া নির্জ্জনে তোমাতে আমাতে মনের কথা আদান প্রদানের সুযোগ পাই, তাহার একটা ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তুমি মুখ হাত ধুইয়া লও। চা খাইয়া, চল, ময়দানে গিয়া একটু বেড়ানো যাক।”

সন্ধ্যার পর কেল্লা হইতে বাহির হইয়া ময়দানের এক জনহীন স্থানে বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চ দেখিতে পাইয়া, সেইখানে দুইজনে বসিয়া, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল।—

অবশেষে স্থির হইল, পার্ক লেনে অথবা ঐ অঞ্চলের কোনও উপযুক্ত বাড়ীতে, বেনামীতে একখানি ঘর ভাড়া লইতে হইবে। সুযোগমত সঙ্কেত অনুসারে সেইখানেই মাঝে মাঝে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ এবং “মনের কথার আদান প্রদান” চলিবে। এল্‌সি বলিল, “তাহারা বোধ হয় ২।৪ মাসের ভাড়া অগ্রিম চাহিয়া বসিবে। কিছু আসবাবও আমাদের আবশ্যক হইবে। আমি সেজন্য তোমায় এক হাজার টাকা দিব। আজ রাত্রেই টাকাটা দিয়া রাখিব—নইলে আমার স্বামী আসিলে অসুবিধা হইতে পারে। এখন ওঠা যাক্ চল, আমাদের ডিনারের সময় হইয়া আসিল।”

মেজর গ্রীণ পরদিন প্রাতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকালে যথানিয়মে মহেন্দ্র তাঁহাকে পড়াইতে গেল। মেজর সাহেব পড়িলেন না—মহেন্দ্রকে চা খাওয়াইয়া, হাসি-খুসী গল্প-গুজবে সময় কাটাইয়া তাহাকে বিদায় দিয়া, সস্ত্রীক টমটমে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন। পরদিনও এইরূপ হইল।

এ দুই দিন এখান হইতে বিদায় হইয়া, মহেন্দ্র পার্ক লেন অঞ্চলে "উপযুক্ত বাড়ী"তে খালি ঘর খুজিয়া বেড়াইল। কিন্তু তখন রাত্রি—কোথাও কোনও সুবিধা করিতে পারিল না। সুতরাং সে স্থির করিল, রবিবারে এই পাড়ায় আসিয়া এ কার্য্যটি সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয় দিন, আফিসে মেজর সাহেব মহেন্দ্রকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "মোহেন্, আমার এখন অনেক কায পড়িয়াছে। এখন আমি আর বাঙ্গলা পড়িবার সময় পাইব না। আর তোমার কষ্ট করিয়া আমার কুঠিতে আসার প্রয়োজন নাই।"—বলিয়া তিনি মহেন্দ্রের প্রাপ্য টাকা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র দেখিল, মেজর সাহেবের মুখখানা গম্ভীর—বিরক্তির ছায়াও তাহাতে সুস্পষ্ট।

মহেন্দ্র আফিসে নিজ স্থানে গিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, না পড়িবার কারণ সাহেব যাহা বলিলেন, তাহাই কি সত্য? না, কাহারও নিকট কোন "কাণাঘুষা" শুনিয়া তাঁহার মনে একটা সন্দেহ প্রবেশ করিয়াছে? যাহা বলিলেন, তাহা আফিসে না বলিয়া, নিজ গৃহেও ত বলিতে পারিতেন! তাঁহার কুঠীতে আর আমি যাই, ইহা কি তাহার ইচ্ছা নয়? বাস্তবিক, এ দিকে একটু বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছিল বৈ কি; সেটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে।"

ইহার দুই দিন পরে মেজর সাহেব আফিসের বারান্দায় আসিয়া হঠাৎ দেখিলেন, কিছুদূরে তাঁহার গৃহভৃত্য একখানি চিঠি হাতে

করিয়া মহেন্দ্রের আফিসের দিকে যাইতেছে। সাহেব বেহারাকে ডাকিলেন। সে ব্যক্তি চিঠিখানি বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া, প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহাকে নিজের খাসকামরায় আনিয়া বলিলেন, "কিস্কা চিঠ্ঠি—ডেখ্লাও।"

প্রভুর সক্রোধ মূর্ত্তি দেখিয়া বেয়ারা কম্পিত হস্তে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল। "টুম্ আভি বাহার বারাণ্ডামে ঠাহরো"—বলিয়া সাহেব চোখে চশমা আঁটিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রীর হস্তাক্ষরে মহেন্দ্রের নাম লেখা। খামের মুখে জল দিয়া ভিজাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা সন্তর্পণে খুলিয়া চিঠি পাঠ করিলেন। সেই কয়েক লাইন ইংরাজীর অনুবাদ এই—

"প্রিয়তম,

আজ তিন দিন তোমার চোখের দেখাটিও দেখিতে পাই নাই। সে জন্য কি কষ্টে যে আছি, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রি নয়টার পর এলিয়ট ট্যাঙ্কের পশ্চিমে, আমাদের সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে বেঞ্চখানিতে তুমি বসিয়া থাকিও। সৌভাগ্যবশতঃ একটা সুযোগ ঘটিয়াছে—ঐ সময় সেখানে গিয়া আমি তোমার সহিত ঘণ্টা দুই যাপন করিতে পারিব। এস—এস—এস—তোমায় না দেখিতে পাইলে আমি মরিয়া যাইব।

তোমারই—

এল্সি।"

মেজর সাহেব কাগজে কিয়া লইলেন—এলিয়ট—ট্যাঙ্ক—পশ্চিমে

— বেঞ্চে। তাহার পর, খামখানি আঠা দিয়া আঁটিয়া ডাকিলেন—"বেয়ারা!" বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন, "যাও, চিঠ্‌ঠি মোহেন্ বাবুকে দেও। হাম ইস্ চিঠ্‌ঠিকো দেখা, মেমসাহেব ইয়ে মোহেন্ বাবু কোইকো মৎ বোলো খবরদার। বোলনেসে—বোলনেসে—"

মেজর সাহেব তাঁহার টেবিলের দেরাজ টানিয়া একটা রিভলভার বাহির করিয়া বেয়ারার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বোলনেসে, হাম তুমকো শূট করেগা—জান মারেগা—সম্‌ঝা ?"

বেয়ারা কম্পিতপদে এক হাত পিছাইয়া গিয়া, করযোড়ে কাতরস্বরে কহিল, "নেহি খোদাবন্দ্—হাম কুছ নেহি বোলেগা। কোইকো নেহি বোলেগা। মেরা জান পিয়ারা হায়।"

মেজর সাহেব রিভলভারটি দেরাজে বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা—ইয়াদ্ রাখ্‌খো, যাও।"

১০

বিকালে মেজর সাহেব স্ত্রীকে বলিলেন, "এল্‌সি, আজ আমি বাড়ীতেই থাইব। বাবুর্চ্চিকে বলিয়া দাও।"

এ কথা শুনিয়া মেমসাহেবের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া সে বলিল, "তবে যে তুমি বলিয়াছিলে, আজ তোমাদের ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে একটা ভোজ আছে—ন'টার সময় তোমায় সেখানে যাইতে হইবে—বাড়ীতে খাইবে না!"

"হ্যাঁ, তা বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু—সেখানে যাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। আজ এম্পায়ারে একটা খুব ভাল ফিল্‌ম্ আছে—চল ডিনারের পর দু'জনে দেখিয়া আসা যাউক।"

এল্‌সি ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, অগত্যা স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইল।

ডিনার শেষে রাত্রি নয়টার সময় টমটম জোতাইয়া, মেজর সাহেব স্ত্রীকে লইয়া বাহির হইলেন। বায়স্কোপে পৌঁছিয়া টমটম বিদায় করিয়া দিলেন—ট্যাক্‌সিতে ফিরিবেন।

সাড়ে নয়টায় বায়স্কোপ আরম্ভ হইল। দশটার পূর্ব্বেই মেজর সাহেব বলিলেন, "তুমি একটু থাক প্রিয়তমে; আমি দশ মিনিট মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছি। বড় পিপাসা পাইয়াছে, বারে গিয়া একটা পেগ পান করিয়া আসি।"

এল্‌সি কোন কথা বলিল না—স্বামীর সঙ্গ তাহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল। মেজর সাহেব চলিয়া গেলে সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল আজ আর মোহেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনই উপায় নাই—সে বেচারী সঙ্কেতস্থানে বসিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিবে।

সাহেব রাস্তা পার হইয়া দ্রুতপদে ময়দানের ভিতর দিয়া চলিলেন। দশ মিনিট পরে উদ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, পথ হইতেই দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষতলের অন্ধকারে বেঞ্চের উপর ফেল্ট হ্যাট্ মাথায় দিয়া কে একজন একাকী বসিয়া আছে।

পথ হইতে নামিয়া, ঘাসের উপর দিয়া সন্তর্পণে তিনি সেই দিকে

অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে তিনি ডাকিলেন —"মোহেন্!"

মহেন্দ্র চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কে, মেজর গ্রীণ?"

"হ্যাঁ। আমি মেজর গ্রীণ। তুমি এ সময়ে এখানে বসিয়া কি করিতেছ, মোহেন্?"

"বায়ু সেবন করিতেছি।"

সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "রাস্কেল! ব্ল্যাগার্ড! বায়ু সেবন করিতেছ? না, আমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিতেছ? বিশ্বাসঘাতক! ড্যাম নিগার শূয়ারকা বাচ্চা! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার—এক জন য়ুরোপীয় মহিলা—আমার স্ত্রীর সহিত প্রেম কর? আমি এই দণ্ডে তোমায় কুকুরের মত হত্যা করিব। তোমার ঈশ্বরকে স্মরণ কর!"—বলিয়া সাহেব সাঁ করিয়া ভিতরের বুক পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিলেন। উহার উজ্জ্বল নলটি অদূরস্থ গ্যাসের আলোকে চক্মক্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু রিভলভার ছুড়িবার অবসর সাহেব পাইলেন না। মহেন্দ্র পালোয়ানগণের নিকট শেখা একটা "ল্যাং" মারিয়া, সেই মুহূর্ত্তে সাহেবকে ধরাশায়ী করিয়া, তীরবেগে ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে ছুটিল।

মেজর সাহেব তাঁহার স্থূল দেহখানি যথাসাধ্য শীঘ্র উঠাইয়া, আবার দুই পায়ে দাঁড়াইয়া, পলায়মান মহেন্দ্রের দিকে রিভলভার লক্ষ্য করিলেন—আওয়াজ হইল গুড়ুম্। সৈনিক পুরুষের শিক্ষিত হস্ত—মহেন্দ্রের মাথার ফেল্টহ্যাট্ উড়িয়া গেল।

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িল না দেখিয়া, সাহেব তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। স্থূলদেহ লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত দৌড়িতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাঁহার রিভলভার গর্জ্জন করিল, "গুড়ুম—গুড়ুম!"

কিন্তু মহেন্দ্র পড়িলও না, তাহাকে সাহেব আর দেখিতেও পাইলেন না। অগত্যা তখন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রিভলভার পকেটে পুরিয়া, পোষাকের ধুলাকাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবার বায়স্কোপ অভিমুখে চলিলেন। তথায় পৌঁছিয়া, বার-এ দাঁড়াইয়া অল্প একটু সোডা সংযোগে একটা ডবল-পেগ ব্র্যাণ্ডি লইয়া এক নিশ্বাসে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। একটা সিগারেট ধরাইয়া অর্দ্ধেকটা খাইয়া, সেটা ফেলিয়া দিয়া ভিতরে গিয়া স্ত্রীর নিকট বসিলেন। এল্‌সি বলিল, "দশ মিনিট মধ্যে আসিব বলিয়া গেলে—প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল, ছিলে কোথায়?"

মেজর সাহেব সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "এক বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।"

১১

মহেন্দ্র সেই নির্জ্জন ময়দানের ভিতর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে যখন দেখিল, বন্দুকের শব্দ বন্ধ হইয়াছে, তখন দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণে সে 'গ্রাস রাইড' রাস্তা পার হইয়া, প্রায় ধোবীতালাওয়ের নিকট পৌঁছিয়াছিল। অন্ধকারে তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পশ্চাদ্ধাবনকারী সাহেবের আর কোনও

চিহ্ন দেখিতে পাইল না। তখন সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ক্রমে লোয়ার সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িয়া, একখানা চল্তি ঠিকা গাড়ী খালি পাইয়া, তাহা ভাড়া করিল। "জানানী-সোয়ারী"র মত সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করিয়া, রাত্রি এগারটার সময় নিজ বাসায় আসিয়া পৌছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া, ভোরে উঠিয়া, মহেন্দ্র ধুতি গামছা আর তাহার মৃতা পত্নীর চিঠির বাণ্ডিলটি লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেল। জলে নামিয়া প্রথমে বাণ্ডিলটি গঙ্গাগর্ভে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। আফিসের সাহেবের নামে কর্ম্মত্যাগপত্র লিখিয়া উহা ডাকে দিয়া, নিজ জিনিষপত্র বাঁধিতে লাগিল। আহারান্তে, বাসায় পাওনাগণ্ডা মিটাইয়া দিয়া, জিনিসপত্রসহ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিল এবং সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ী পৌছিয়া জননীকে প্রণাম করিল।

মা বলিলেন, "কি বাবা, ছুটী নিয়ে এলি ?"

"না মা,—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম। পরের এস্তাজারি আর পোষাল না।"

অমন চাকরীটা ছাড়িয়া আসাতে মা বড় দুঃখ করিতে লাগিলেন।

মেমসাহেবের সেই হাজার টাকায়, চাষের জমী কিছু বাড়াইয়া হাল-গরু কিনিয়া মহেন্দ্র চাষবাস আরম্ভ করিয়া দিল এবং পরের মাসেই নিকটস্থ গ্রামের একটি সুন্দরী "ডাগর" মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল।

বৎসর দুই পরে মহেন্দ্র তাহাদের গ্রামের লাইব্রেরীতে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে মেজর গ্রীণের নাম ছাপা দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া খবরটা পড়িল। ইহা বিলাতী সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত। ভারতীয় সেনাবিভাগের মেজর গ্রীণ এক বৎসরের ফার্লো লইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন; তিনি লণ্ডনের আদালতে মোকর্দ্দমা করিয়া, বিবি এল্‌সি গ্রীণের সহিত তাঁহার বিবাহবন্ধন ছেদন করিয়াছেন এবং কো-রেস্পণ্ডেণ্ট, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী টার্ণার নামক কোনও যুবকের বিরুদ্ধে হাজার পাউণ্ড খেসারতের ডিক্রী পাইয়াছেন।

—*—

হারাধন

—:*:—

মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বহুকাল তাহাতে তৈল-স্পর্শ ঘটে নাই, কৃষ্ণবর্ণ কৃশ দেহ, কোটরগত চক্ষু, অত্যন্ত ছিন্ন মলিনবেশী এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সিরাজগঞ্জ বাজারে রামলোচন সরকারের চাউলের আড়তে আসিয়া বলিল, "বাবু মশায়, আজ সারাদিন আমি কিছু খেতে পাইনি।"

রামলোচন তহবিল মিলাইবার জন্য সম্মুখে রাশিকৃত টাকা পয়সা, সিকি, দুয়ানি প্রভৃতি লইয়া গণিয়া গণিয়া থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। ভিখারীর প্রতি চোখের কোণে একবার দৃষ্টিমাত্র করিয়া, একটা পয়সা তাহার দিকে ঠক্ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পয়সাটি কুড়াইয়া লোকটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া করুণস্বরে বলিল, "একটা পয়সায় কি হবে বাবু? সারাদিন কিছু খাইনি।"

এইবার রামলোচন ভাল করিয়া লোকটার মুখের পানে চাহিলেন। চেহারা দেখিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় একটু দয়ার সঞ্চার হইল; বলিলেন, "ভাত খাবে?"

লোকটা বলিল, "আজ্ঞে, তাই যদি দুটি আজ্ঞে হয়।"

"আচ্ছা বোস তা হ'লে। সন্ধ্যেটা দেখিয়েই দোকান বন্ধ করবো। বাসায় নিয়ে গিয়ে তোমায় ভাত খাওয়াব; ঐ যে

পয়সাটা দিলাম, ময়রার দোকানে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে ততক্ষণ জল খাওগে।”—বলিয়া তিনি তহবিল মিলাইতে মন দিলেন।

রামলোচন সরকার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার নিবাস এ স্থানে নহে, তবে এই জিলাতেই বটে। বাজারে এই চাউলের আড়তটি তাঁহার পৈতৃক আমলের ; বাজার হইতে কিছু দূরে নদীর সন্নিকটে দ্বিতল বাসবাটীখানিও তাঁহার পিতা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচন ও তাঁহার কনিষ্ঠ পদ্মলোচন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কারবার চালাইতেন। পিতার জীবিতকালেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল, বড়বধূর নাম তারাসুন্দরী, ছোটর নাম রাধারাণী। বাড়ীতে বিধবা মাতা ছিলেন, তাঁহার সেবা ও ঘর গৃহস্থালী কর্ম্মের জন্য উভয় বধূ এককালে এখানকার বাসাবাটীতে আসিয়া থাকিতে পারিতেন না—পালাক্রমে ছয় মাস করিয়া এক জন বাটীতে থাকিতেন, এক জন বাসাবাটীতে আসিয়া স্বাধীন গৃহিণীপনার সুখাস্বাদন করিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর এই বন্দোবস্তই চলিয়া আসিতেছিল ; এক দিন হঠাৎ কলেরা রোগে পদ্মলোচনের মৃত্যু হইল। ইহার পর বিধবা জননীও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, মাস ছয়েক পরেই তাঁহার পুত্রশোক, চিতার আগুনে নির্ব্বাপিত হইল। সেই অবধি তারাসুন্দরীই সিরাজগঞ্জের বাসাবাটীতে কায়েম হইলেন, রাধারাণী তাঁহার শ্বশুরের ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া রহিলেন। বড়বধূও অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকদিন থাকিতে পারেন না, বাসাবাটীতে কর্ত্তাকে, অতিথি-অভ্যাগতকে ভাত জল দেয় কে? সম্প্রতি দিন

পনেরো হইল, ছোট বধূ বাসাবাটীতে আসিয়া রহিয়াছেন, কারণ তারাসুন্দরী এখন সন্তানসম্ভাবিতা—দিনও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

২

তহবিল মিলানো শেষ করিয়া, টাকাগুলি বাসায় লইয়া যাইবার জন্য খেরুয়ার থলিতে ভরিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামলোচন থেলো হুঁকা হাতে করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বকথিত সেই ভিখারী আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। রামলোচন বলিলেন, "কি হে, জল্‌টল্ কিছু খেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এক পয়সার বাতাসা কিনে জল খেলাম।"

"বেশ। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীহারাধন দত্ত। কায়স্থ।"

"কায়স্থ? বেশ বেশ। আচ্ছা, বস ঐখানটায়।"

—বলিয়া, যে চৌকিখানির একপ্রান্তে তাঁহার "গদী", চক্ষুর ইঙ্গিতে রামলোচন তাহারই অপর প্রান্ত দেখাইয়া দিলেন। হারাধন বসিল।

হুঁকায় কয়েক টান দিয়া রামলোচন বলিল, "কায়স্থ? বটে! তা, তোমার এমন অবস্থা হ'ল কি ক'রে?"

হারাধন নীরবে আপন ললাটে হস্তার্পণ করিল।

রামলোচন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ত বটেই, সে ত বটেই। অদৃষ্টই হচ্ছে মূলাধার। বাড়ী কোথা তোমার?"

"কোথাও নেই। বাড়ী ঘর থাকলে কি আর পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই বাবু?"

"তবু—তোমার বাপ-পিতামহ কোথায় থাকতেন, কোথায় তুমি জন্মেছিলে, কোথায় ছেলেবেলা কাটিয়েছ, সে সব ত বলতে পার?"

হারাধন মাথাটি নাড়িয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে মশাই অনেক কথা! বলতে গেলে মহাভারত।"

রামলোচন ভাবিলেন, পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহার অবস্থা ভাল ছিল, গ্রহবৈগুণ্যবশে এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, সে সকল কথা বলিতে বোধ হয় লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিতেছে। ভাবিলেন, সকলই অদৃষ্টের খেলা, কখন কার কি অবস্থা দাঁড়ায়, কিছুই ত বলা যায় না। এ বিষয়ে উহাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। করুণাপূর্ণ নয়নে লোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন, "তামাক খাবে?"

"আজ্ঞে দিন"—বলিয়া হারাধন হাত বাড়াইল। রামলোচন কলিকাটি খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন; হুঁকা দিলেন না, কারণ যদিও এ ব্যক্তি নিজেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে—সত্যই কায়স্থ কি না, তাই বা কে জানে! লোকে কথায় বলে, "জাত হারালে কায়েত।"

হারাধন কলিকাটি লইয়া, তাহা অঙ্গুলিপুটে ধারণ করিয়া, হস্তদ্বারা কৃত্রিম হুঁকা রচনা করিয়া খুব জোরে জোরে তিন চারিটা দম লাগাইল। তাহার দাপট দেখিয়া রামলোচন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে না কি?"

"বড় তামাক"—অর্থাৎ গাঁজা। হারাধন বলিল, "মাঝে মাঝে তাও চলে বৈ কি!"—বলিয়া কলিকাটি সে রামলোচনকে প্রত্যর্পণ করিল। রামলোচন তখন সেটি নিজের হুঁকায় বসাইয়া, দুই এক টান দিয়াই বুঝিতে পারিলেন, উহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। রামলোচন ডাকিলেন—"বেজা! পিদিপ্‌টে জ্বাল রে।" বালক ভৃত্য ব্রজনাথ গদীর উপর একটি পিতলের রেকাবী বসাইয়া, প্রদীপসহ পিলসুজটি তাহার উপর রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। রামলোচন তখন "হরিবোল হরি—দুর্গা দুর্গা, জয় মা অন্নপূর্ণা" প্রভৃতি দেবদেবীর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বেজা তার পর প্রদীপটি হাতে করিয়া, দোকানের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, "সন্ধ্যা দেখাইয়া" আসিল। দোকানের গোমস্তা এবং ওজনদার উভয়ে মিলিয়া, সকল দ্বার ও জানালাগুলি সাবধানে বন্ধ করিয়া, মোটা মোটা হুড়কা তুলিয়া দিল। চাউলের বস্তা প্রভৃতিও যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, নিজ নিজ পিরিহান ও চাদর প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রামলোচন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া, গোমস্তার হাতে দিয়া, টাকার থলি হাতে লইয়া আড়তের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ম্মচারিগণ বাহির দ্বারটি বন্ধ করিয়া তাহার নানা স্থানে বড় বড় তালা লাগাইয়া, চাবির গুচ্ছ প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিল। "এস হে হারাধন"—বলিয়া রামলোচন অতিথি ও ভৃত্যসহ বাসা অভিমুখে চলিলেন; কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

৩

হারাধনকে বাসায় লইয়া গিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় তাহাকে বসাইয়া রামলোচন বলিলেন, "রান্নার ত এখনও দেরী আছে ; তুমি এখানে ব'স ততক্ষণ,আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসি।"—বলিয়াই তিনি আগন্তুকের বস্ত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কাপড় ছাড়বে ? একখানা ধুতিটুতি পাঠিয়ে দেবো ?"

হারাধন বলিল, "হ'লে ত ভালই হয়।"

"আচ্ছা ব'স। বলিয়া রামলোচন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজ শয়নঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, ভিতরে তাঁহার স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছেন—ছোট বউ সেখানে বসিয়া ছিলেন, ভাসুরের পদশব্দ পাইয়া অপর দ্বার দিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। রামলোচন প্রবেশ করিয়া,টাকার থলি এবং আড়তের চাবির গুচ্ছ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো দেখ, একজন ভিকিরী সারাদিন কিছু খায় নি, তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, তাকে দুটি ভাত দিতে হবে। আর কিছু জলখাবার—দুই এক টুকরো শসা কি পেঁপে, আর কিছু মিষ্টি যদি থাকে—বেজাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও, বাইরের ঘরের বারান্দায় সে ব'সে আছে। আর দেখ,আমার একখানা ছেড়াখোঁড়া ধুতি যদি খুঁজে বের ক'রে দিতে পার ত ভাল হয়, সে কাপড় ছাড়বে।"

প্রস্তাবগুলি শুনিয়া তারাসুন্দরী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। বলিলেন, "ভিকিরী না কুটুম ? এত খাতির যে ?"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড় কুটুম,—তোমার ভাই! ওগো ভিকিরী হ'লেও সে ছোটলোক নয়—কায়স্থ সন্তান। আমিও যা, সেও তাই, তবে অবস্থার গতিকে সে এখন ভিকিরী, আমি চেলের মহাজন!"

"ওঃ—আচ্ছা, তা দিচ্চি"—বলিয়া তারাসুন্দরী খোকাকে দুধ খাওয়ান শেষ করিতে মন দিলেন। রামলোচনও মুখ-হাত ধুইবার আয়োজন করিলেন।

জলযোগাদি শেষ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলেন, হারাধনের আর সে চেহারা নাই। স্নানান্তে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, এখন তাহাকে ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে। রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, চান করেছ যে দেখছি!"

হারাধন বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নদীতে গিয়ে চান ক'রে এলাম।"

"খেলে টেলে কিছু?"

"খেলাম বৈ কি। বড় গিন্নী খানিকটা ফুটি আর গুড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে প্রাণটা শীতল হ'ল।"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড়গিন্নী কি মেজো গিন্নী, তা তুমি জানলে কি ক'রে? তুমি এরই মধ্যে আমার সাংসারিক খবর সব পেয়ে গেছ দেখছি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার বেজা চাকরকে জিজ্ঞেস ক'রে সব কথাই জেনে নিলাম।"

রামলোচন সেখানে বসিয়া হারাধনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর, প্রতিদিনই তিনি এই বৈঠকখানা-ঘরে

বসিয়া আহারের পূর্ব্বে দুই এক ছিলিম "বড় তামাক" সেবন করিয়া ক্ষুধায় শাণ দিয়া ল'ন—কেহ সাথী জুটিলে তাহার সঙ্গে বসিয়া—নচেৎ একাকী। বড় তামাকের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই হারাধনের সহিত তাঁহার হইয়া গিয়াছিল—এবার তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। নেশাটি ক্রমে জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রামলোচন অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িলেন। হারাধনের কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার মনটি তৎপ্রতি অত্যন্ত স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, প্রস্তাব করিলেন, হারাধন যতদিন ইচ্ছা এখানে অতিথিস্বরূপ অবস্থান করিতে পারে।

রাত্রি নয়টার সময় বেজা আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। হারাধনকে লইয়া রামলোচন অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শয়নঘরের বারান্দাতেই আহারের স্থান হইয়াছিল। হারাধন বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই ঘরেই আপনার শয়ন হয় বুঝি ?"

রামলোচন বলিলেন, "হ্যাঁ, এই ঘরখানিতে আমি শুই। এই পাশাপাশি ঘর দু'খানি আমার দু'ভাইয়ের ছিল আর কি। ভাই ত আমার দাগা দিয়ে চ'লেই গেলেন !"—বলিয়া, গাঁজার প্রভাবে তাঁহার পুরাতন ভ্রাতৃশোক নূতন হইয়া উঠিল। ভাত খাইতে খাইতে, কোঁচার খুঁটে তিনি চক্ষু মুছিলেন। "হ্যাঁ—সবই ত আমি শুনেছি।"—বলিয়া হারাধন উর্দ্ধমুখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছোট বধূ রাধারাণীই ভাত বাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল। এই সময় সে ভাসুরের দুধের বাটি লইয়া আসিয়াছিল—ভাসুর ও আগন্তুকের

এই কথোপকথন শুনিয়া, ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া আগন্তুকের পানে চাহিল। হারাধনের দৃষ্টিও ঠিক এই সময় অবগুণ্ঠনবতীর পানে ফিরিল। উভয়ে চোখোচোখি হইবামাত্র রাধারাণীর দৃষ্টি রোষ ও বিরক্তি জ্ঞাপন করিল। হারাধন তখনই মাথাটী নিচু করিয়া, সন্তুপ্তস্বরে বলিল, "হরি হে, তোমারই ইচ্ছা!"

৪

রামলোচনের সুনজরে পড়িয়া গিয়া, হারাধন পরম আরামে তথায় অধিষ্ঠান করিল। প্রাতে উঠিয়াই বাবুর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে যায়; স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাবুর সহিত আড়তে গিয়া বসে। রামলোচন দেখিলেন, হিসাব-পত্র লিখিতে সে সুদক্ষ; গত বৎসরের সালতামামি হিসাব এখনও করা হয় নাই—সেই হিসাব প্রস্তুত করিবার ভার তিনি হারাধনের প্রতি অর্পণ করিয়া, নিজে হুঁকা হাতে করিয়া মনের সুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দশ বার দিন কাটিলে, রামলোচনের স্ত্রী তারাসুন্দরী একটি পুত্র প্রসব করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মিয়াছিল; সূতিকাগৃহ হইতেই নানা রোগে ভুগিয়া তাহারা জননীর কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। তাই রামলোচন এবার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানীয় হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু ও পাসকরা ধাত্রী প্রতিদিন আসিয়া সকল বিষয় তদারক করিয়া, উপদেশ ও ঔষধের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন। এই গোলমালে রামলোচন আর নিয়মিতভাবে দোকানে যাইতে পারেন না। মাঝে

মাঝে দুই একঘণ্টা গিয়া গদীতে বসেন ; তার পর হারাধনের প্রতি দোকানের ভার দিয়া চলিয়া আসেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব পরীক্ষা করেন, তহবিল বুঝিয়া লন ; গোপনে কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও দেখিয়াছেন, হারাধনের হিসাবে কোথাও একটি পয়সার গরমিল পান নাই।

হারাধনের প্রতি বাবুর এই নির্ভর ও বিশ্বাস দেখিয়া, কর্ম্মচারীরা কিন্তু মনে মনে চটিতে লাগিল। চাল নাই চুলা নাই কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, তাহার প্রতি এতটা বিশ্বাসস্থাপন করা যে বাবুর পক্ষে নিতান্তই মূঢ়তা হইতেছে, ইহাই তাহারা অন্তরালে বলাবলি করিতে লাগিল। দোকানের গোমস্তা নরহরি সাহা এক দিন তাহার মনের এই সন্দেহের কথা বাবুকে বলিয়াছিল, কিন্তু বাবু তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। নরহরি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, সরকার ও ওজনদারের নিকট বলিয়াছিল, "ভালোর তরেই বলেছিলাম, কিন্তু বাবু শুনলেন না। শুনবেন কেন, কাঙালের কথা বাসি না হ'লে ত মিষ্টি লাগে না।"

অশৌচান্তে তারাসুন্দরী আঁতুড়ঘর হইতে বাহির হইয়া, নাইয়া ধুইয়া ঘরে উঠিলেন। এক দিন তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, তোমার গেলবছরের সালতামামি হিসেবটা হয়ে গেছে কি ?"

"কেন ?"

"ছোট বউ বলছিল, দিদি, বট্‌ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরো, এ ক'বছরে কত টাকা মুনফা হয়েছে। আমার ভাগের অর্দ্ধেক টাকাটা যদি বট্‌ঠাকুর দেন ত তীর্থধর্ম্ম ক'রে আসি।"

শুনিয়া রামলোচন গুম্ হইয়া রহিলেন।

স্বামীকে নীরব দেখিয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবছ কি?"

রামলোচন বলিলেন, "আমি ভাবছি কি শুনবে? পদ্মলোচন, ত আজ পাঁচ বৎসর হ'ল গিয়েছে। কৈ, এত কাল ত ছোট বউমা এ কথা কোনও দিন উত্থাপন করেন নি। আজ হঠাৎ এ কথা কেন!"

বড় বউ বলিলেন, "কেউ বোধ হয় সলাপরামর্শ দিয়েছে, যে আড়তের অর্দ্ধেক মালিক ত তুই, তোর ভাসুরই বা সব একলা খায় কেন?"

"কে ওঁকে এ বুদ্ধি দিলে সন্ধান নিতে পার?"

"দেখব চেষ্টা ক'রে। আপাততঃ ওকে কি বলি, তা আমায় ব'লে দাও।"

"বোলো যে, হিসেবপত্র এখনও তৈরী হয় নি—আর হিসেবের জন্যে আটকাচ্চেই বা কি? দু' একশো টাকা যদি ওঁর দরকার হয় ত চেয়ে নেন যেন।"

ছোট বউ কিন্তু দুই এক শত টাকার কথা কাণে তুলিলেন না। বলিলেন, "না দিদি, দু' একশো টাকায় আমার কিছু হবে না। পাঁচ বছরে লাভে লোকসানে মিলিয়ে কিছু না হয়ে থাকে, তবু অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকাও লাভ হয়েছে—আমায় এখন আড়াই হাজার টাকা বট্‌ঠাকুর দিন, পরে হিসেবপত্র হ'লে, আমার পাওনার বাকী টাকা দিলেই চলবে।"

সংসারে এই লইয়া বড়ই একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। পূর্ব্বে উভয় যা'য়ে বেশ সম্প্রীতি ছিল, তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিত, এখন উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ হইয়াছে বলিলেই হয়। ইতিমধ্যে রামলোচন একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছে খবর পাইলেন, হারাধন এক দিন স্থানীয় কোনও প্রসিদ্ধ উকীলের বাড়ীতে গিয়া বসিয়া ছিল।

৫

সে দিন সন্ধ্যায় বাসায় আসিয়া রামলোচন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বউমার সম্বন্ধে তোমার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

তারাসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"উকীল বাড়ী যায় কেন হারাধন?"

তারাসুন্দরী, স্বামীর প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি কথা! ছি ছি—এমন কি কখনও হ'তে পারে?"

রামলোচন বলিলেন, "হারাধনের কি এমন তালুক-মুলুক জ্যোৎজমা আছে, যার জন্যে ওকে উকীল-বাড়ী যেতে হয়? আরও দেখ, এত দিন না তত দিন, হারাধন আসার পর থেকেই ছোট বউ-মা এই গণ্ডগোল সুরু করেছে। আর একটা কথা। আমার যেমন মতিচ্ছন্ন, গেল বছরের সালতামামী হিসেবটা আমি ঐ হেরোকেই তৈরী করবার ভার দিয়েছিলাম।"

"গেল বছর লাভ কি হয়েছে?"

"প্রায় হাজার টাকা। সেই ধরেই ছোট বউমা বোধ হয় হিসেব করেছেন, পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার টাকা। দেখ, আমি নিশ্চয় বলছি, হেরোর সঙ্গে ছোট বউমার কোনও যোগাযোগ আছে। বাড়ী থেকে হতভাগাকে তাড়িয়ে দিই, কি বল ?"

"তা দাও! কিন্তু, আমার ত ও কথা বিশ্বাসই হয় না। ছি ছি, এ কি কখনও হতে পারে ? চব্বিশ ঘণ্টা ত দুজনে একসঙ্গে রয়েছি, তার কথায় বার্ত্তায় চালচলনে কৈ, কোন দিন মনে ত কিছু সন্দেহ হয় না।"

এ কথা শুনিয়া রামলোচন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইরা রহিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি যা-ই বল না কেন বড় বউ, ভিতরে কোনও গোলযোগ আছেই আছে। ছোট-বউই বা লাভের অংশ দাবী করে কেন, আর হেরোই বা উকীল বাড়ী যায় কেন? ভারী ত আমাদের মাসী-মার কুটুম, পরমুণ্ডে দুবেলা খাচ্চেন দাচ্চেন—দিই ওকে দূর ক'রে, কি বল ?"

তারাসুন্দরী নীরবে কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তার পর বলিলেন, "এখন হঠাৎ কিছু না ক'রে দিনকতক চোখ-কাণ খুলে থাকা যাক এস। যদি সে রকম কোনও বেচাল দেখতে পাই, তখন দুটোকেই ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলেই হবে।"

রামলোচন পত্নীর এ যুক্তিই উপস্থিত ক্ষেত্রে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচনা করিলেন।

৬

ছোট বউ ও হারাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে যে কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় হইয়াছে, তাহা কর্ত্তা বা গিন্নী নিজ নিজ কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এক দিন বেলা দশটার সময়, রান্নাঘরের বারান্দায় বড় বউ ছেলে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন, ছোট বউ কুটনা কুটিতেছেন, এমন সময় "কি গো বড় গিন্নি, কেমন আছ গো?"—বলিয়া একজন বয়স্কা বিধবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই স্ত্রীলোক দেশে ইহাদের বাড়ীর কাছেই বাস করে, ইঁহাদেরই প্রজা। তারাসুন্দরী বলিলেন, "দুলে-বউ যে!—ভাল আছিস্ ত দুলে বউ?"

"হ্যাঁ, মা, তোমাদের ছিচরণ আশীর্ব্বাদে ভালই আছি।" - বলিয়া নিম্নে দাঁড়াইয়া বারান্দার প্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া সে উভয় বধূকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এই খোকাটি এবার বুঝি হয়েছেন? তোমার খোকা হয়েছে, তা আমি দেশে থাকতেই শুনেছিলাম। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেঁচে থাকুক!"

বড় বউ বলিলেন, "ব'স্ দুলে বউ, ব'স্। এখানে কোথায় এসেছিলি? কবে এলি?"

"এই পশু´ দিন এসেছি মা। আমার জামাই এখন এইখানেই চাকরী করে কি না, সে এখন আদালতের পেয়াদা হয়েছে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে বেশ দু'পয়সা ওজগারও কর্ছে। আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছে, এইখানেই বাসা ভাড়া নিয়ে আছে। মেয়েকে অনেক দিন

দেখিনি তাও বটে, তোমার খোকাটি হয়েছে শুনেছিলাম তাও বটে, তাই মনে করলাম যাই একবার দেখা-শুনো করে আসি।”

“তা বেশ করেছিস্। তোর মেয়ে জামাই ভাল আছে ত?”

“হ্যাঁ মা, তারা ভাল আছে।”

ভুলে বউ বসিয়া বসিয়া গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পরে বলিল, “আচ্ছা তা হলে এখন উঠি মা, বেলা হয়ে গেল। সকালেই দেশে যাব মনে করছি।”

তারাসুন্দরী কহিলেন, “উঠবি কেন ভুলে বউ? এতদিন পরে এলি, এইখানেই দুটি খেয়ে যা। নাওয়া হয়েছে?”

“না মা, নাওয়া এখনও হয় নি। তা বেশ, দুটি পেসাদ দিও, খেয়েই যাব। তোমাদের খেয়েই ত মানুষ মা; আজ বলে নয় সাত পুরুষ। তা একটু তেল দাও, নদীতে যাই।”

ভুলে বউ নদী হইতে স্নান করিয়া যখন ফিরিল, তখন প্রতি-দিনের প্রথামত রামলোচন হারাধনকে লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন। ভুলে বউ গোয়ালঘরের ছায়ায় নারিকেলগাছের আড়ালে বসিয়া হারাধনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পুরুষদের আহার শেষ হইলে, ভুলে বউকে ভাত দিয়া, বড় বউ ও ছোট বউ খাইতে বসিলেন। আহারান্তে ছোট বউ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন। ভুলে বউ পুকুরঘাটে গিয়া আঁচাইয়া আসিয়া নিজ আহারস্থান পরিষ্কার করিল। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া, আলগোছে গিন্নীর হাত হইতে একটি পাণ লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, “গিন্নিমা একটা কথা আছে, কিছু যদি মনে না কর ত বলি।”

তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা তুলে বউ?"

"ঐ যে মিন্সেটা বাবুর সঙ্গে ব'সে খেলে, ও কে? তোমাদের কেউ হয়?"

"না, আমাদের কেউ না, দোকানের মুহুরী।"

"কত দিন এসেছে?"

"এই মাস খানেক হবে। কেন তুলে বউ, এ কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছিস্ কেন?"

তুলে বউ এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "ও লোক ভাল নয় মা, ওকে তাড়িয়ে দাও। ছোট গিন্নী এখানে আসবার মাস খানেক আগে, ও মিন্‌সে আমাদের গাঁয়ে গিয়েছিল। ও কে, কি বিত্তান্ত কেউ জানে না। যদি মিথ্যে বলি ত আমার জিভ্যে যেন খ'সে যায় মা— সন্ধ্যের পর তোমাদের বাড়ীর বাগানের ধারে, পুকুরঘাটের পথে—এই রকম সব জায়গায়, দু'তিন দিন ছোট বউয়ের সঙ্গে ফুস্থর ফুস্থর ক'রে কথা কইতে ওকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি কেন, আরও কত নোক দেখেছে। এ নিয়ে গাঁয়ে একটু কাণাকাণিও সুরু হয়েছিল। তার পর মিন্‌সে কোথায় চলে গেল, আর দেখতে পাইনি। আবার এখানে এসেও জুটেছে দেখছি! কার মনে কি আছে তা নারায়ণই জানেন, কিন্তু এসব কি ভাল মা? তোমরা ভদ্দরনোক, গাঁয়ের মাথা, ছি ছি, এ কি কাণ্ড!"—বলিয়া তুলে বউ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তারাসুন্দরী কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। তিনি কেবলই ভাবিতে

লাগিলেন, তবে ত স্বামী যাহা সন্দেহ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক, আমার বিশ্বাসই ত ভুল!

৭

অপরাহ্নকালে ছোট বউ বলিলেন, "দিদি, এখন তুমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছ, বট্‌ঠাকুর আমার টাকাগুলির ব্যবস্থা করে দিলেই আমি দেশে চলে যেতে পারি। আড়াই হাজার টাকা যদি এখন নাও হয়ে ওঠে, আপাততঃ দু'হাজার পেলেও আমার চল্‌বে—পরে তখন হিসেবপত্র দেখে যা হয় তা দেবেন। আজকে বট্‌ঠাকুরকে তুমি বোলো মনে করে দিদি।"

বড় বউ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তা বলবো।" মনে মনে বলিলেন, "তোমায় হাতেনাতে একবার ধরি দাঁড়াও, ধ'রে আচ্ছা করে ঝাঁটাপেটা করি, তার পর বোধ হয়, তুমি দেশে না গিয়ে কাশী কি বৃন্দাবন যেতেই চাইবে।"

রাত্রে আহারাদির পর নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া তারাসুন্দরী স্বামীকে বলিলেন, "ওগো, তুমি যা সন্দেহ করেছিলে, তাই ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল।"—বলিয়া ছোট বউ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদটি তিনি স্বামীর গোচর করিলেন। টাকার জন্য আজ আবার ছোট বউয়ের তাগাদার কথাও বলিলেন। অবশেষে বলিলেন, "টাকাটা ফেলেই দাও। দিয়ে পাপ বিদেয় কর। নইলে এখানে বাসায় আমাদের চোখের সামনে কি কাণ্ড হতে কি কাণ্ড হবে, ভাবতেও আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রামলোচন নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। কোনও মতামত ব্যক্ত না করিয়া অবশেষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলেন!

কিন্তু নিদ্রা তাঁহার চক্ষুতে আসিল না। ঘণ্টাখানেক এ পাশ ও পাশ করিয়া তিনি উঠিলেন। নগ্নপদে বাহিরে গেলেন। উঠানে নামিয়া দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বৈঠকখানাঘরের বারান্দায় নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। এ কয়দিন গভীর রাত্রে প্রায়ই তিনি এইরূপ "রোঁদে" বাহির হইতেছেন, দেখিতে আসেন, হারাধন নিজ স্থানে শয়ন করিয়া আছে কি না। অন্যান্য দিন বৈঠকখানা ঘর ভিতর হইতে বন্ধ দেখিতে পান; আজ দেখিলেন বাহিরে শিকল চড়ানো।

দেখিয়া, তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইয়া উঠিল। বৈঠকখানার পাশ দিয়া, তিনি বাগানে প্রবেশ করিয়া নিজ শয়নকক্ষের পশ্চাতে গিয়া পৌঁছিতেই দেখিতে পাইলেন, ছোট বউয়ের ঘরের পশ্চাতের জানালার কাছে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ভিতরের মানুষের সঙ্গে চুপি চুপি কি কথা-বার্ত্তা কহিতেছে।

সাবধানে আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিয়া চিনিলেন, ও ব্যক্তি হারাধনই বটে। রাগে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যেন পাগলের মত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ বাঘের মত লম্ফ দিয়া গিয়া সজোরে লোকটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পাজি, নচ্ছার হারামজাদ! এই তোর কায? আয় শালা, তোকে আজ খুন করে এইখানেই পুঁতি।"—বলিয়া হারাধনকে পাড়িয়া ফেলিলেন। উভয়ে মহা ঝটাপটি আরম্ভ হইল।

ব্যাপার দেখিয়া ছোট বউ নক্ষত্রবেগে নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তারাসুন্দরীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতে লাগিল—"দিদি দিদি, ওঠ। সর্ব্বনাশ হ'ল, বট্‌ঠাকুর খুন করছেন।"

"কি কি"—বলিয়া তারাসুন্দরী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ছোট বউ বলিল, "দিদি বারণ কর, বারণ কর। ও অন্য কেউ নয় —ও আমার দাদা—আমার সহোদর ভাই। আমি টাকা চাইনে দিদি—তোমার পায়ে পড়ি, আমার দাদাকে বাঁচাও।"

তারাসুন্দরী খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার প্রায় নীচে বাগানে একটা প্রবল মারামারির শব্দ এবং স্বামীর কণ্ঠস্বরে "খুন করব তোকে" এই কথা কয়টি শুনিলেন। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অ্যাঁ-অ্যাঁ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

বড় বধূর অবস্থা দেখিয়া ছোট বউ নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা, দাদা, পরিচয় দাও।"—কিন্তু এই সময় হারাধন উঠিয়া চোঁচাঁ দৌড় দিল, এবং রামলোচন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ; সুতরাং ছোট বউয়ের কথাগুলি উভয়ের মধ্যে কাহারও কর্ণগোচর হইল না।

৮

হারাধনকে ধরিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে রামলোচন যখন ক্ষতবিক্ষতপদে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন দেখিলেন,

উভয় বধূই একত্র মেঝের উপর বসিয়া আছেন, তিনি প্রবেশমাত্র ছোট বউ উঠিয়া অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "হেরো শালাকে ত ধরতে পারলাম না, পালিয়ে গেল; এখন ডাক ঐ হারামজাদীকে। নাক কাণ কেটে ঝাঁটা মেরে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও।"

বড় বউ বলিলেন, "চুপ চুপ। অমন কথা মুখে এনো না।"

রামলোচন স্ত্রীর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? ও কথা বলছ কেন?"

বড় বউ বলিলেন, "ওগো মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ হারাধন আর কেউ নয়, ছোট বউয়ের দাদা।"

রামলোচন বলিয়া উঠিলেন, "সে কি?"

"ওর এক দাদা ছিল, সে পাবনার বাজারে এক রাত্রে একটা খারাপ স্ত্রীলোককে খুন ক'রে ফেরার হয়েছিল শোন নি? ওই সেই দাদা। হারাধন ত নয়, ওর আসল নাম হীরালাল।"

রামলোচন বলিলেন, "বল কি? ও ছোট বউয়ের ভাই? তা সে হ'ল ফেরারী আসামী, এখানে কি করতে এসেছিল শুনি?"

"বোনের কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে।"

রামলোচন মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া, খাটের পায়ায় ঠেস্ দিয়া বলিলেন, "জল দাও।"

তারাসুন্দরী উঠিয়া এক গেলাস জল আনিয়া দিলেন। সমস্ত জলটুকু ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিয়া গেলাস নামাইয়া

রাখিয়া রামলোচন বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু—কথাটা কি সত্যি? না, নষ্ট স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধি?"

ইঁহারা জানিতেন না, ছোট বউ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। সে তখনই দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, নিজ কক্ষে গিয়া বাক্স খুলিয়া, তাহা হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া লইল। বড় বউয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কোলের উপর কাগজগুলা ফেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বট্‌ঠাকুরকে এগুলি পড়ে দেখতে বল দিদি।"

লণ্ঠনের আলো বাড়াইয়া দিয়া রামলোচন কাগজগুলি পড়িতে লাগিলেন। এগুলি, এই বাসাতে থাকাকালীন "হারাধন" লিখিয়াছে। ভগিনীর নিকট টাকার তাগাদা, ভাসুরের নিকট পাঁচ বৎসরের মুনাফার অংশ হিসাবে অন্ততঃ ২৫০০৲ টাকা দাবী করার জন্য উপদেশ; উকীলের পরামর্শের কথা; অবশেষে একখানি পত্রে, অন্ততঃ পক্ষে আপাততঃ ২০০০৲ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি। স্পষ্টই বুঝা গেল, "হারাধন" এই পত্র গুলি রাত্রে পশ্চাতের জানালা দিয়াই হউক; অথবা অপর কোনও সুযোগেই হউক, তাহার ভগিনীর হাতে দিয়াছিল।

পত্রগুলি পড়িয়া রামলোচন বলিয়া উঠিলেন—"জয় ভগবান! জাত কুল রক্ষে করলে বাবা!"—বলিয়া পত্রগুলির মর্ম্ম স্ত্রীকে জানাইলেন।

অতঃপর রামলোচন বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে ব্যবসায়ে তাহার লাভের অংশস্বরূপ ৩০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপন্যাস-কলেজ

——)*(——

"সুন্দরী যত হো'ক আর না হো'ক, ভাল রকম লেখাপড়া জানা মেয়ে ভিন্ন, আর কাউকে বিয়ে করবো না",—ইহাই ছিল অবিনাশের আকৈশোর প্রতিজ্ঞা। একটি মাত্র ছেলে—পিতা অবিনাশের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণও করিয়াছিলেন। সে ম্যাট্রিকে এবং আই-এ-তে বৃত্তি পাইয়াছিল, ডবল অনার্স লইয়া বি-এ পাস করিয়া এম-এ পড়িতেছে, দেশে কিছু বিষয় সম্পত্তিও আছে—এমন সুপাত্র —বিবাহের বাজারে তাহার দর আট হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু সদয়-হৃদয় পিতৃদেব নগদ ছয় হাজার টাকা লোকসান স্বীকার করিয়া, বেসরকারী কলেজের গরীব অধ্যাপক হরকুমার গাঙ্গুলীর কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিলেন।

বিশেষ করিয়া সুন্দরী বধূ কামনা না করিলেও, প্রজাপতি অবিনাশকে সুন্দরী বধূই দিলেন। কনের নাম সুষমা, বয়স ১৬॥ বৎসর, এ বৎসর সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে—রেজল্ট এখনও বাহির হয় নাই।

বিবাহ হইল ৫ই আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই হইতে পারিত, কিন্তু জ্যেষ্ঠ ছেলের বিবাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে হইতে নাই। অবিনাশের পিতা রাধাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় খুলনা জেলার অধিবাসী।

পুত্রবিবাহ জন্য সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া এক মাসের জন্য শ্যামবাজারে বাড়ী-ভাড়া করিয়াছেন।

ফুলশয্যার রাত্রেই কনেকে বিশেষ ভাবে জেরা করিয়া অবিনাশ জানিতে পারিল যে, সে কবিতা লেখে এবং কবিতায় পরিপূর্ণ দুই-খানি খাতা ভবানীপুরে তাহার বাক্সমধ্যে আছে। শুনিয়া আনন্দে অবিনাশ যেন পাগল হইয়া উঠিল। বলিল, "আসবার সময় খাতা দু'খানি আনলে না কেন সুষু?—আমি দেখতাম!"

নববধু বলিল, "সে খাতা আমি কাউকে দেখাই?"

অবিনাশ বলিল, "কিন্তু আমি কি 'কাউ' ?"

কনে বলিল, "তুমি 'কাউ' হবে কেন, তুমি 'বুল্'।"

বধূর এই রহস্যপটুতায় একটা দীনবন্ধু বা ডি-এল রায়ের প্রতিভার সন্ধান পাইয়া অবিনাশ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, "সাধে কি আর শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করবো প্রতিজ্ঞা করেছিলাম?"—কোনও কবিতা যদি মুখস্থ থাকে, তবে তাহাই শুনিবার জন্য অবিনাশ বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কোনও কবিতাই সুষমার মুখস্থ নাই। বরের আগ্রহ ও আক্ষেপ দর্শনে অবশেষে সে আশ্বাস দিল—"আট দিন পরে, আমার সঙ্গে তুমি ত যোড়ে যাবে আমাদের বাড়ী, তখন দেখাব।"

অবিনাশ বলিল, "আট দিন ধৈর্য্য ধরে থাকাই বা যায় কেমন করে?"

২

আট দিন আট রাত্রি অতিবাহিত হইল। উভয়ের আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গতা, অভিন্নহৃদয়তা এই আট দিনে এতই বিশাল ও গভীর হইয়াছে যে, অবিনাশের স্থির বিশ্বাস—বোধোদয় কথামালা পড়া কোনও মেয়ের সহিত বিবাহ হইলে, আট বৎসরেও তাহা হইত কি না তাহা সন্দেহ।

আট দিন পরে অবিনাশ "যোড়ে" শ্বশুরবাড়ী গেল। স্ত্রীর লিখিত কবিতা পাঠে তাহার অষ্টাহব্যাপী আকুল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। কবিতাগুলি পড়িয়া সে এতই প্রশংসা করিতে লাগিল যে, বেচারী সুষমা সত্য সত্যই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, "কি বল তুমি তার ঠিক নেই! ভারি ত কবিতা– তারই এত সুখ্যাতি!" অবিনাশ, রবিবাবু কোট করিয়া বলিল, "পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা—জান না নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা!" —অবিনাশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—যত শীঘ্র সম্ভব, কবিতাগুলি পুস্তাকাকারে সে ছাপাইয়া ফেলিবে। কলেজ খুলিলেই মেসে বসিয়া স্বহস্তে খাতা নকল করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রেসে দিবে।

নিজালয়ে অষ্টাহ, শ্বশুরালয়ে অষ্টাহ—এই ষোড়শ দিন কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল অবিনাশ ভাল বুঝিতেই পারিল না। অবশেষে বিদায়-রজনী উপস্থিত হইল। গভীর নিশীথে, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, পরস্পরের বক্ষে অবিরল অশ্রুজল সেচন ইত্যাদি ইত্যাদি একরকম শেষ হইলে অবিনাশ বলিল, "তুমি রোজ একখানি ক'রে চিঠি

আমায় লিখবে। নইলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে—পড়াশুনো চুলোয় যাবে—আমি ফেল হব।"

সুষমা বলিল, "তা লিখবো বৈ কি! তুমিও আমায় রোজ একখানি চিঠি লিখবে ত?"

অবিনাশ বলিলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"আর ফি শনিবারে আসবে ত? বাবা ত তোমায় বলেই রেখেছেন—মা-ও যাবার সময় তোমায় বলবেন। শনিবার বিকেলে আসবে, রবিবার থেকে, সোমবার সকালে উঠে চা-টা খেয়ে মেসে ফিরে যাবে। কেমন, কথা রইল ত?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়! – কিন্তু, অতদিন অতদিন বাদে এক একটিবার দেখা—সহ্য করা শক্ত যে সুষু! মাঝে অন্ততঃ একটি দিন—ধর বুধবার—তোমার মুখখানি আর একবার আমার দেখতে পাওয়া চাই।"

সুষমা ক্ষুণস্বরে বলিল, "কিন্তু তা কি করে হবে?"

অবিনাশ বলিল, "আমি তার একটা উপায় স্থির করেছি। তুমি, প্রতি বুধবারে, বেলা ঠিক আটটার সময়, তোমাদের ছাদে উঠে, উত্তর-পশ্চিম কোণটায় দাঁড়াবে। আমিও ঠিক সেই সময় হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যাব। যদিও এ বাড়ী গলির ভেতর, কিন্তু হরিশ মুখুয্যের রোড থেকে ছাদের প্রায় আধখানা বেশ দেখা যায় তা জান ত?"

সুষমা বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি। হরিশ মুখুয্যের রোড দিয়ে যখন বর-টর যায় আমরা ছাদে উঠে দেখি কি না।"—বলিয়া সুষমা ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

হাসির কারণ জানিবার জন্য অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সুষমা বলিল, "একটা কথা মনে হ'ল তাই হাসলাম।"

"কি কথা—বল—বল।"

"মনে হ'ল, এতদিন ছাদে উঠে পরের বর দেখে মরেছি, এখন নিজের বরটিকে দেখে বাঁচবো। কেবল রোশনাই, বাজনা-বাদ্যি থাকবে না এই যা তফাৎ।"

অবিনাশ প্রিয়তমার এই রসিকতায় স্বয়ং কালিদাসের কবিত্ব-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিল। আনন্দবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া, চুম্বনের ফাঁকে ফাঁকে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর তোমার ভাব; কি সুন্দর তোমার প্রকাশ-ভঙ্গি! কিন্তু কেন রোশনাই থাকবে না? চোখে যাদের প্রেমের মাণিক জ্বলছে, তাদের কি রোশনাইয়ের অভাব? হৃদয়ে যাদের স্বর্গের বীণা বাজছে তাদের অন্য বাজনার দরকার কি?"

অবিনাশ শ্বশুরালয় হইতে শ্যামবাজারে পিতামাতার নিকট ফিরিবার দিন দুই পরেই, তাঁহাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অবিনাশ কিন্তু বাড়ী যাইবার কোনও উদ্যোগ করিল না। পিতাকে বলিল, "আর মোটে তিন হপ্তা ত আছে কলেজ খুলতে। আবার যাওয়া, আবার আসা, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ বৈ ত নয়! তার চেয়ে বরঞ্চ মেসেই গিয়ে থাকি!"

পুত্রের অন্তরের গোপন অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, পিতা মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, সেই ভাল। পড়াশুনা বেশ মন দিয়ে কোর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সে আমায় বলতে হবে না। এখন মেস ত প্রায় খালি, পড়াশুনোর বেশ সুবিধে হবে। অনেকটা সেই কারণেও, এখন বাড়ী যেতে চাচ্ছি নে।"—বলিয়া অবিনাশ সরিয়া পড়িল। ভাবিল, বুড়োদের ঠকানো কি সহজ!

৩

পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এ পাঁচ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সুষমা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস হইয়াছে—ইহা ত বিবাহের অল্পদিনের পরেরই ঘটনা। অবিনাশ উচ্চ সম্মানের সহিত এম-এ পাস হইয়া, আশুবাবুর কৃপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছে। এই সময় তাহার একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করে—কন্যাটি এখন তিন বৎসরের। ভবানীপুরে, শ্বশুরালয়ের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া লইয়া অবিনাশ সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পর ফিরিয়া নিজ কক্ষে বসিয়া অবিনাশ ডাকিল, "ও বউ, শোন"—অবিনাশ তার স্ত্রীকে এইরূপই সম্বোধন করিয়া থাকে; শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কিন্তু অবিনাশ তাহা গ্রাহ্য করে না।

"বউ, একটা কথা শুনে যাও।"—

বউ তখন ঝির সাহায্যে রান্নাঘরে বসিয়া রুটি বেলিতেছিল—স্বামীর আহ্বানে উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ঘরে আসিল।

দেখিল, স্বামী একখানি খবরের কাগজ নিবিষ্টমনে পাঠ করিতেছেন।

স্ত্রীর পদশব্দে অবিনাশ মুখ তুলিয়া বলিল, "ব্যস্ত ছিলে ?"

"রুটি বেলছিলাম।"

"দেরী কত বউ ?"

"কেন, ক্ষিদে পেয়েছে ? আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে যাবে।"

"না, ক্ষিদে পায় নি। একটা বিশেষ কথা ছিল,—তা সব সেরেই তুমি এস।"

"কেন, কি হয়েছে, বল না।"

"সে, একটু সময় লাগবে। তুমি কায সেরে এস, তার পর ধীরে সুস্থে কথাবার্ত্তা হবে।"

স্বামীর গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সুষমা ভীত হইয়া বলিল, "হ্যাঁগা, কোনও মন্দ খবর নাকি ?"

অবিনাশ ব্যস্তভাবে বলিল, "না না কোনও মন্দ খবর নয়— ভাল খবরই। যাও তুমি কায সেরে এস।"

"আচ্ছা"—বলিয়া সুষমা চলিয়া গেল।

অবিনাশ আবার সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইয়া, নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিতে লাগিল ঃ—

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

সাহিত্য-সেবাকাঙ্ক্ষীর অপূর্ব্ব সুযোগ

উপন্যাস কলেজ

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে কথা-সাহিত্যের কিরূপ সমাদর তাহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ যুগটা বিশেষ করিয়া গল্প ও উপন্যাসেরই যুগ বলিতে হইবে। ভাল গল্প ভাল উপন্যাসের জন্য প্রকাশকেরা, মাসিক সম্পাদকগণ হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, অথচ তাঁহারাই প্রতিদিন, নবীন লেখক লেখিকা-গণের রচিত শত শত গল্প ও উপন্যাস, অনুপযুক্ত বোধে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ, লেখক লেখিকাগণ কোন রূপ ট্রেণিং (তামিল) না পাইয়াই লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। রীতিমত গুরূপদেশ ভিন্ন, কোনও কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করা যায় না। দেশের এই মহা অভাব দূর করিবার জন্য কয়েকজন বিখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক মিলিয়া এই "উপন্যাস কলেজ" স্থাপন করিয়াছেন। রীতিমত উপদেশ দিয়া, সাপ্তাহিক এক্সারসাইজ সংশোধন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে কথাসাহিত্য-রচনার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে দুইটি বিভাগ আছে—ছাত্র বিভাগ ও ছাত্রী বিভাগ। সোম, বুধ ও শুক্রবারে ছাত্র বিভাগে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবারে ছাত্রী বিভাগে লেকচারাদি হইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভর্ত্তি হইবার ফী ১০৲ টাকা এবং মাসিক বেতন ৬৲ টাকা মাত্র। এখনও উভয় বিভাগে কয়েকটা করিয়া সীট খালি আছে—যাঁহাদের প্রয়োজন, সত্বর আবেদন করুন। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে, এক আনার ষ্ট্যাম্প সহ আবেদন করুন। ঠিকানা— ২২৫ নং সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।"

বিজ্ঞাপনটির উপরিভাগে একটী সুবৃহৎ পাঁচতলা বাড়ীর ছবি আছে।

বিজ্ঞাপনটি বার দুই পড়িয়া, অবিনাশ কাগজখানি রাখিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইল। স্ত্রীর অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে, তাহার মনে বড় আশা হইয়াছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীমতী সুষমা দেবীর পদার্পণ মাত্র দেশময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে—তাহার বৈঠকখানায় পুস্তক-প্রকাশক ও মাসিক সম্পাদকগণের ভিড় লাগিয়া যাইবে, দেশশুদ্ধ লোক সমস্বরে বলিবে, হাঁ, এতদিন পরে বাঙ্গালা ভাষায় খাঁটি কাব্যরসের আস্বাদ পাওয়া গেল বটে! কিন্তু অবিনাশের সে মনের আশা মনেই লয় পাইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর কয়েক মাস মধ্যে, স্ত্রীর অনেকগুলি কবিতা একত্র করিয়া, অবিনাশ "পুষ্পহার" নামক একখানি বহি ছাপাইয়া বাজারে বাহির করিয়াছিল। কিন্তু পুষ্পহারের আদর হয় নাই—আগাগোড়া সব কথা ভাবিলে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হয় যে, সমালোচকগণ ও পাঠক সাধারণ জোট বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া, তার বউয়ের বইখানি বয়কট করিয়াছে। তা ছাড়া বই বাহির হইবার পর বছর খানেক ধরিয়া, সুষমার অন্ততঃ একশোটি নূতন কবিতা, অবিনাশ ভিন্ন ভিন্ন মাসিকে পাঠায়—তার মধ্যে ৯৫টি ফেরৎ আসিয়াছিল, পাঁচটি মাত্র ছাপা হইয়াছিল, তাও মফঃস্বলের পত্রিকায়। এই কারণে, অবিনাশ বড়ই ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থির বুঝিয়াছে, কাব্যের যুগ এখন আর নাই;—এ যুগে স্বয়ং কালিদাস একখানি নূতন মহাকাব্যের

পাণ্ডুলিপি হাতে করিয়া কলিকাতায় আসিলে, কোন প্রকাশকই নিজব্যয়ে তাহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে সম্মত হইবেন না—অথচ তাঁহারাই রামা শ্যামা নিধের অতি ওঁচা উপন্যাসও গোগ্রাসে গিলিতেছেন! বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিত হইয়াছে—বঙ্গে গল্প উপন্যাসেরই যুগই আসিয়াছে বটে। সুষমার মত প্রতিভাশালিনী লেখিকা যদি উপন্যাস রচনায় মন দেয়, তবে তাহার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উহারা বিজ্ঞাপনে ঐ যে কথা লিখিয়াছে, গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ কোনও কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না তাহাও ঠিক। ঐ কলেজেই বউকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া অবিনাশের ইচ্ছা—এখন বউ রাজি হইলে হয়।

৪

বউ রাজি হইল, কিন্তু অনেক তর্কবিতর্ক, মান অভিমানের পর।

সুষমা বলিয়াছিল, "আমি না হয় একটু ইংরিজিই শিখেছি, কিন্তু তা বলে' মেম ত আর হই নি! জুতো মোজা প'রে ট্রামে চ'ড়ে এ বয়সে আমি কলেজে যেতে পারি কখনও?"

"কেন, জুতো মোজা প'রে ট্রামে চড়ে তুমি বায়স্কোপ দেখতে যেতে না বউ? আজকালই না হয় খুকী হয়ে অবধি—"

"সে ত তোমার সঙ্গে যেতাম।"

"তা বেশ ত! একলা যেতে যদি তোমার ভয় হয়, আমি সঙ্গে করে তোমায় রেখে আসবো গো!"

"দু'জনকার ট্রাম ভাড়া লাগবে ত? তার পর, কলেজের ছ' টাকা মাইনে আছে, কাপড় চোপড়ের খরচ, ধোবার খরচও বাড়বে—চালাবে কেমন ক'রে?"

"মাইনের টাকায় না কুলোয়, আমি না হয় একটা প্রাইভেট টিউশন মিউশন যোগাড় করে' নেবো এখন, তার জন্যে ভাবনা কি? না হয় দিন কতক একটু টানাটানি করেই কাটানো যাবে। তার পর, যখন তোমার এক একখানি উপন্যাস বেরুবে, তখন টাকা যে হুড় হুড় করে আসতে আরম্ভ হবে বউ!"

"তা কি কিছু বলা যায়? এতদিন কবিতা লিখেছি—গল্প উপন্যাস লিখতে কখনও ত চেষ্টা করিনি! চেষ্টা করলেই যে সফল হব এমন কি কথা আছে?"

"আসল কথা কি জান? প্রতিভাই হল আসল জিনিষ। সে প্রতিভা তোমায় যথেষ্ট রয়েছে—সেটা তুমি কাব্যেই খাটাও আর উপন্যাসেই খাটাও—তোমার হাত থেকে উঁচুদরের রচনা বেরুতে বাধ্য যে।"

"প্রতিভা ট্রতিভা আমার কিছুই নেই। ও সব আমি পারবো না,—এ নিয়ে আমায় পীড়াপীড়ি কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া সুষমা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

অবিনাশ অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সুষমা আড়চোখে স্বামীর পানে

চাহিল ; একটু অনুতাপের স্বরে বলিল, "অমনি রাগ হল পুরুষের !"

স্ত্রীর দিকে না চাহিয়া অবিনাশ বলিল, "রাগ নয় বউ, দুঃখ।"

স্বামীর হাত ধরিয়া সুষমা বলিল, "কেন কিসের দুঃখ তোমার ? সবাইকের স্ত্রী কি আর অনুরূপা নিরুপমা হতে পারে ?"

অবিনাশ বলিল, "না না, আমার দুঃখের কারণ তা নয়। আমার দুঃখের কারণ, মোহভঙ্গ।"

"কেন, কি মোহ তোমার ভঙ্গ হল শুনি ?"

অবিনাশ আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখ, এতদিন আমার ধারণা ছিল যে আমাদের দুজনের প্রেম, আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম। এখন দেখছি আমার সে ধারণাটা একটা মোহ —একটা ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।"

সুষমা ক্ষুণ্নস্বরে বলিল, "কেন, ভুল কিসে ?"

অবিনাশ বলিল, "যথার্থ দাম্পত্য-প্রেম কাকে বলে ? প্রাণেশ্বর —প্রাণেশ্বরী ব'লে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়াই কি দাম্পত্য-প্রেম ? বঙ্কিম বাবু কি বলেছেন মনে নেই ? সমহৃদয়তা, একাভিসন্ধিতা— সেইটেই হল আসল দাম্পত্য-প্রেম। নইলে, আমি বলবো যাব দক্ষিণে, তুমি বলবে যাবে উত্তরে—এ রকম হলে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম হয় না।"

স্বামীর বেদনা-জড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুষমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। সস্নেহে তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "তুমি দুঃখ কোরো না—আমি তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে আমি তাই করবো।"

তখন আবার দুইজনে 'ভাব' হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটি আবার পঠিত হইল। কত কথার আলোচনা হইল। সুষমা সেই বিজ্ঞাপনের উপরিভাগের মুদ্রিত পঞ্চতল অট্টালিকা দেখিয়া বলিল, "উঃ বাড়ীটা ত মস্ত! অবিনাশ বলিল, "তা হবে না? এত বড় একটা ব্যাপার —কত ছাত্র ছাত্রী ভর্ত্তি হবে তার কি হিসেব আছে?"

৫

ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে, উভয়ে একদিন গিয়া কলেজটি দেখিয়া আসিবার পরামর্শ ছিল, সেই পরামর্শ আজ কার্য্যে পরিণত হইবে। আজ বিকালের ঘণ্টায় অবিনাশের ক্লাস ছিল না; বেলা দুইটার সময় সে বাড়ী আসিয়াছে। চারিটা বাজিলেই, স্ত্রীকে প্রস্তুত হইবার জন্য সে তাগাদা দিতে লাগিল।

সুষমা জুতা মোজা পরিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, বেলা সাড়ে চারিটার সময় স্বামীর সহিত বাহির হইল। দুজনে ট্রামেই গেল। কলুটোলা ষ্ট্রীটের মোড়ে নামিয়া, পাঁচ মিনিট মধ্যেই নূতন রাস্তায় উপন্যাস কলেজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিল, বাড়ীটা বিজ্ঞাপনের ছবির অনুরূপ প্রকাণ্ড পঞ্চতল অট্টালিকাই বটে; কিন্তু সমস্তটাই উপন্যাস-কলেজ নহে। নীচের তলার কুঠুরিগুলিতে চা চপ কাটলেটের "কেবিন", সাইকেল মেরামতের দোকান, পানবিড়ির দোকান, ময়রার দোকান প্রভৃতি—দোতলাটা মাত্র কলেজ। ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতলে মাড়োয়ারীগণ বাস করে।

যাহা হউক, উভয়ে দ্বিতলে উঠিল। প্রথমেই একটা কক্ষের বাহিরে আঁটা তক্তায় "অফিস" অঙ্কিত দেখিয়া, পর্দ্দা ঠেলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিল। গোঁফদাড়ি কামানো ঝাঁকড়া চুল, চোখে সোণার চশমা আঁটা এক যুবক রেজিষ্টারি বহি, খাতা-পত্র লইয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি আগন্তুকদ্বয়ের পানে চাহিয়া, চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া, একখণ্ড নিয়মাবলী এবং একখানি ভর্ত্তি হইবার ফর্ম্ অবিনাশের হাতে দিলেন। অবিনাশ ও সুষমা একত্র তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

পাঠ শেষে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "ছাত্রীবিভাগে কতগুলি মেয়ে ভর্ত্তি হয়েছে মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, "জন ত্রিশ এ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হয়েছে। আরও অ্যাপ্লিকেশন আসছে। পঞ্চাশ পূর্ণ হলে আর আমরা নেবো না; মেয়েদের ক্লাস-ঘরে আর বেশী ধরবে না। এত ছাত্রী ভর্ত্তি হতে চাইবে আগে তা আমরা ভাবিনি।"

"মেয়েদের ক্লাসে কে কে পড়াবেন?"

কেরাণী বাবু একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া তাহার উপর চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, "ছোট গল্প সম্বন্ধে লেকচার দেবেন সরোজ রায়, আর শৈলেন চাটুয্যে। উপন্যাস সম্বন্ধে রজনী বাবু আর লীলাবতী সেন। ভাষা বর্ণনা শেখাবেন নৃপেন সোম আর চঞ্চলা দেবী।"

সকলেই জানেন—সুষমা অবিনাশও জানিত—বর্ত্তমান বঙ্গীয় "তরুণ" সাহিত্যে এই লেখক লেখিকাগণের স্থান কত উচ্চে।

অবিনাশ বলিল, "এঁরা ত আজকালকার খুব নামজাদা সাহিত্যিক।"

কেরাণীবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়।"

"ঐ যে সরোজ বাবুর নাম করলেন, 'নবরশ্মি' মাসিক পত্রের সম্পাদক সরোজ বাবু কি ?"

"তিনিই।"

"তা হলে ষ্টাফ্ ত খুব ষ্ট্রং হয়েছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। নইলে আর ভর্ত্তি হবার জন্যে এত ভিড়!"

"আচ্ছা—নমস্কার মশাই—এখন তাহলে আমরা উঠি।"—বলিয়া অবিনাশ দাঁড়াইল। কেরাণীবাবু বলিলেন, "যদি ভর্ত্তি হওয়াই স্থির হয়, তবে বেশী দেরী করবেন না,—কারণ স্থান বড়ই কম,—আর যে রকম অ্যাপ্লিকেশন আসছে—"

"যে আজ্ঞে—দেরী করবো না—খুব সম্ভব, কালই এসে টাকা জমা দিয়ে যাব।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৬

পরদিনই অবিনাশ গিয়া সুষমার ভর্ত্তি হওয়ার ফী প্রভৃতি জমা দিল। সপ্তাহ পরে লেকচার আরম্ভ হইল। সেদিন অবিনাশ বেলা দুইটার সময় স্ত্রীকে তাহার কলেজে পৌঁছাইয়া, নিজকর্ম্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। বেলা চারিটায় সুষমার ছুটি হইবে—অবিনাশের কার্য্যও তৎপূর্ব্বেই শেষ হইবে। উপন্যাস কলেজে গিয়া স্ত্রীকে লইয়া সে ট্রামে বাড়ী ফিরিবে।

ছুটির পর রাস্তায় বাহির হইয়া সুষমা স্বামীকে বলিল, "ওগো দেখ, বলেছিল যে পঞ্চাশ জন পর্য্যন্ত ছাত্রী নেওয়া হবে—তা নয়, আমি নিয়ে মোটে সাতাশটি মেয়ে ত দেখলাম—আর সবাই কোথায় গেল ?"

অবিনাশ বলিল, "আজ ত মোটে প্রথম কিনা। যারা ভর্ত্তি হয়েছে, সবাই বোধ হয় আজ আসেনি। ক্রমে ক্রমে সব আসবে বোধ হয়।"

ট্রামে উঠিয়া, দু'জনে বেশী কথাবার্ত্তা হইল না। বাড়ী আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের পর, চা খাইতে বসিয়া অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি কি হল বউ ?"

"আমরা সবাই ক্লাসে বসলাম। তার পর ঘণ্টা বাজলো, বর্ণনা শিক্ষার প্রোফেসার নৃপেন সোম এলেন। বোর্ডের গায়ে একখানা মস্ত ছবি টাঙ্গিয়ে দিলেন। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি এক মিন্সে ; চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে ; বয়স ত্রিশের বেশী নয়। প্রোফেসার বল্লেন,—'এই লোকটার চেহারা তোমরা সবাই এক মনে বেশ করে খানিকক্ষণ দেখ—তার পর, খাতায় এর চেহারার বর্ণনা লেখ—আর, উপস্থিত এর মনের ভাব কি হওয়া সম্ভব—তাও অনুমান ক'রে লেখ।'—এই ব'লে তিনি পকেট থেকে এক তাড়া প্রুফ বের করে, দেখতে বসে গেলেন। আমরা ছবিখানা দেখে, বর্ণনা লিখতে লাগলাম।"

"তার পর ?"

"ঘণ্টা শেষ হলে, তিনি খাতাগুলো সব নিলেন। দ্বিতীয়

ঘণ্টায় এক এক খানা খাতা নিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন, আর ভুল ত্রুটি গুলি সব বোঝাতে লাগলেন।"

"তুমি কি লিখেছিলে?"

"আমি চেহারাটা বর্ণনা করবার পর লিখেছিলাম, প্রথম যৌবনে একটি মেয়ের সঙ্গে এর ভালবাসা হয়েছিল, কিন্তু মেয়ের বাপের ঘোর আপত্তি থাকায় বিয়ে হতে পারে নি। তখন দু'জনে পরস্পরের নিকট এই প্রতিজ্ঞা ক'রে বিদায় নিয়েছিল যে, তারা আজীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন ক'রে, পরলোকে মিলনের আশায় থাকবে। মেয়েটী পিতৃগৃহেই রইল, যুবকটি মনের খেদে বনবাসী হল। দশ বৎসর পরে যুবকের ইচ্ছা হল,—দূর থেকে একবার তার প্রিয়তমাকে চোখের দেখা দেখে আসবে। বন ছেড়ে লোকালয়ে এসে দেখলে, তার প্রিয়তমা দিব্যি বিয়ে থাওয়া ক'রে, ছেলে মেয়ের মা হয়ে সংসার ধর্ম্ম পালন করছে। তাই, দেখে, যুবকের মনে ভয়ানক দুঃখ ও রাগ হয়েছে।"

অবিনাশ বলিল, "এনক আর্ডেন। অন্য ছাত্রীরা সব কি লিখেছিল?"

সুষমা বলিল, "সে সব অদ্ভুত। কেউ লিখেছিল এ খুন কিম্বা ডাকাতি করতে যাচ্ছে—কেউ লিখেছিল গাঁজা খেয়ে এ পাগল হয়ে গেছে—এই রকম সব।"

"প্রোফেসর কি বল্লেন?"

"তিনি আমারটাই খুব ভাল হয়েছে বল্লেন। বল্লেন, যে সকল লোকের সঙ্গে তুমি সংস্রবে আস,—তোমার স্বামী, আত্মীয় স্বজন,

দাস দাসী—সকলের মুখ দেখে তাদের মনের ভাবটা বিশ্লেষণ করতে সর্ব্বদা চেষ্টা করবে। মনস্তত্ত্বই হ'ল আসল জিনিষ—সেইটে যিনি যত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন,—উপন্যাস রচনায় তিনি তত বেশী সিদ্ধিলাভ করবেন।'—বল্লেন, 'তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ রয়েছে, এক মনে সাধনা কর।'—আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন।"

এই সংবাদ শ্রবণে অবিনাশের বুকটা আহ্লাদে দশহাত হইল। বলিল, "তোমার ভিতর প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ যে আছে, এটা ত অনেক দিন আগেই তোমার এ অধম ভৃত্য আবিষ্কার করেছিল!"

সপ্তাহে তিন দিন সুষমার ক্লাস হইয়া থাকে। অবিনাশ তাহাকে নিয়মিত ভাবে কলেজে পৌছাইয়া দেয় এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। লেক্‌চার, এক্সারসাইজ প্রভৃতি কিরূপ হইতেছে তাহা নিত্যই সে খবর লয়।

একদিন সুষমা বলিল, "ওগো, কালকে আমাদের ডবল ক্লাস—বেলা একটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কলেজ। ছোট গল্পের প্রোফেসর সরোজ রায়, আমাদের একটি গল্পের চুম্বক দেবেন—ক্লাসে বসে—সেই গল্পটি চা'র ঘণ্টায় আমাদের সবাইকে লিখতে হবে। যে গল্প সব চেয়ে ভাল হবে, সেটি সরোজ বাবু তাঁর 'নবরশ্মি' কাগজে ছেপে দেবেন বলেছেন।"

"আচ্ছা বেশ, কাল আমি তোমায় সময় মত কলেজে পৌছে দেবো এখন।"

পরদিন অবিনাশ তাহাই করিল। তার নিজ ক্লাস সেদিন

তিনটা হইতে চারটা। সুতরাং দুই ঘণ্টা কাল তাহাকে গোলদীঘির ধারে বসিয়া "স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে" কাটাইতে হইল। বৃক্ষছায়ায় বেঞ্চির উপর বসিয়া, বায়ুভরে গোলদীঘির ঈষত্তরঙ্গিত বক্ষের পানে চাহিয়া, তাহার নিজ বক্ষও আশার হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী সুষমা দেবীর নব প্রকাশিত উপন্যাসের প্লাকার্ডে কলিকাতার দেওয়াল ছাইয়া যাইবে! এমন একদিন কি আসিবে না, যেদিন পথে, ট্রামে, ট্রেণে, সভাসমিতিতে, আমাকে দেখাইয়া লোকে ফুসফুস্ করিয়া বলাবলি করিবে—'ও লোকটা কে জান হে? ওই হচ্চে সুষমা দেবীর স্বামী!'—আশা কাণে কাণে কহিল—"আসিবে, সেদিন আসিবে।"

৭

এক্সারসাইজ স্বরূপ লিখিত সুষমার গল্পটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে বিবেচনায় প্রোফেসার সরোজ রায় সেটি "নবরশ্মি" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যেদিন উহা প্রকাশিত হয়, অবিনাশ স্বয়ং "নবরশ্মি" কার্য্যালয়ে গিয়া ঐ সংখ্যা পঁচিশ খানি কিনিয়া আনিয়া, কুড়ি খানা ডাকযোগে আত্মীয় বন্ধুবর্গের নিকট পাঠাইয়া দিল। বউয়ের গল্পটির শিরোনামার উভয় পার্শ্বে মোটা লাল পেন্সিলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল। কোনও বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দুই চারি কথার পরই অবিনাশ বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা,

'নবরশ্মি' কাগজে বউয়ের একটা গল্প বেরিয়েছে পড়েছ কি ?"—এবং বন্ধুকে, সেখানে বসাইয়া, গল্পটি আগাগোড়া না পড়াইয়া ছাড়িত না। একখানি 'নবরশ্মি' সর্ব্বদাই তাহার পকেটে থাকিত, এবং প্রায় প্রতিদিনই সে নিজে গল্পটি দুই একবার পড়িত।

একদিন অবিনাশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কাল তোমাদের কি বিষয়ে লেকচার হচ্চে বউ ?"

সুষমা বলিল, "প্রেম-তত্ত্ব। প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের স্বরূপ আর প্রেমের প্রকারভেদ হয়ে গেছে—কথা-সাহিত্যে প্রেমের প্রভাব এখন হচ্চে। কিন্তু সরোজ বাবু যা বলছেন, তা কিন্তু আমার মনে লাগে না।"

"সরোজ বাবু কি বলছেন ?"

"তিনি বলছেন, দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে, নিষিদ্ধ, পরকীয় পরকীয়া প্রেমের রস বেশী—আবেগ বেশী উন্মাদনা বেশী, তাই নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র থাকলেই গল্প উপন্যাস সব চেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। এই কথা শুনে, সাত আটটি মেয়ে চটেমটে ত কলেজ ছেড়েই দিয়েছে।"

"আজকাল তোমাদের কলেজে ছাত্রী সংখ্যা কত ?"

"আমি নিয়ে ঊনত্রিশটি।"

"কেন ? প্রথম দিনেই ছিল সাতাশটি। পঞ্চাশজন পর্য্যন্ত নেওয়া হবে—সে পঞ্চাশ ত কোন কালে পূরে যাবার কথা। এত কমে গেল কি করে বউ ?"

সুষমা বলিল, "পঞ্চাশ কোনও দিনই হয়নি। একচল্লিশ বিয়াল্লিশ জন হয়েছিল। তার পর আবার অনেকে ছেড়ে দিলে।"

"কেন ? ছেড়ে দিলে কেন ?"

"দু'জনার, ছেলে হবে বলে তারা চলে গেছে। প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে সাত আট জন পালালো। আরও তিন চার জন, তাদের স্বামীদের মত থাকলেও শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মত নেই, তাঁরা শুনে রাগ করেছেন, সেই ওজুহাতে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে। দেখ, আমারও কিন্তু আর ভাল লাগছে না—পাছে তুমি রাগ কর, সেই জন্যে এতদিন আমি তোমায় বলিনি। বিশেষে ঐ সরোজ রায়—যখন থেকে 'নব-রশ্মি'তে আমার গল্পটা বেরিয়েছে, তখন থেকে আমার সঙ্গে যেন কি রকম ব্যবহার করে।"

"কি রকম ব্যবহার করে ?"

"পুরুষ শিক্ষক আর যুবতী ছাত্রীর মধ্যে যে শোভন ব্যবধানটুকু থাকা দরকার, তা সে আর রেখে চলছে না।"

অবিনাশ হাসিয়া বলিল, "ওটা তোমার ভুল, সুষমা। তরুণ সাহিত্যের তিনি একজন অত বড় লেখক—অত বড় কাগজের সম্পাদক—হঠাৎ তাঁর প্রতি কোন মন্দ উদ্দেশ্য আরোপ করা তোমার উচিত নয়। তুমিই হলে ক্লাসের সব চেয়ে ভাল ছাত্রী—সবার চেয়ে তোমার উপরেই বেশী ভরসা রাখেন—তাই বোধ হয় একটু আত্মীয়তার ভাব এসে পড়েছে। ওটা কিছু নয়।"

কিছুদিন পরে সুষমার খুকীর জ্বর হইল। জ্বরটা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই কারণে এক সপ্তাহ সুষমা কলেজ যাইতে পারিল না।

সপ্তাহ পরে, খুকী আরোগ্য লাভ করিলে, অবিনাশ স্ত্রীকে আবার যথারীতি কলেজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

যথাসময়ে স্ত্রীকে আনিতে গিয়া অবিনাশ শুনিল, আজ কলেজ বন্ধ—রাসপূর্ণিমার ছুটি। স্ত্রীর খোঁজ করিতে দ্বারবান বলিল, মাইজী বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। প্রবল জ্বরে তিনি কাঁপিতেছিলেন, চক্ষু দুইটি 'লাল-সুরুখ' হইয়াছিল, দ্বারবান ট্যাক্সি ডাকিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিয়াছে।

অবিনাশ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে ট্রামে বাসায় ফিরিল। বাসায় আসিয়া ভৃত্যের নিকট শুনিল,—মাইজী কলেজ হইতে ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আর উপরে উঠেন নাই, ঝিকে ডাকিয়া গঙ্গাস্নানের বস্ত্রাদি আনিতে আদেশ দিয়া কালীঘাট যাতায়াতের জন্য তাহাকে ঠিকা গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ী আসিবামাত্র খুকীকে ও ঝিকে লইয়া তিনি কালীঘাট যাত্রা করিয়াছেন।

শুনিয়া অবিনাশ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর শরীর কেমন দেখলি?" ভৃত্য বলিল, "কেন, শরীর ত ভালই ছিল বাবু। 'তিনি বলেছেন গঙ্গাস্নান ক'রে, কালীঘাটে পূজো দিয়ে তার পর ফিরবেন। বল্লেন বাবু এলে বোলো তিনি যেন না ভাবেন।"

ব্যাপারটা অবিনাশের নিকট দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত মনে হইল। প্রবল জ্বর ও রক্তচক্ষু লইয়া কলেজ হইতে যে মানুষ চলিয়া আসিল, বাড়ী আসিয়াই, তার জ্বর ভাল হইয়া গেল, সে গঙ্গাস্নানে বাহির হইল! হঠাৎ কালীঘাটে পূজা দিবারই বা অর্থ কি?

যাহা হউক, অবিনাশ ধৈর্য্য সহকারে স্ত্রীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল

৮

সন্ধ্যার সময় সুষমা ফিরিল। সদ্যস্নাতা, পরিধানে গরদ, সীমন্তে মোটা করিয়া সিন্দূর লিপ্ত—অবিনাশ স্ত্রীর এই পবিত্রমূর্ত্তি দেখিয়া প্রীতিবিহ্বলনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। সুষমা আসিয়াই গড় হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।

অবিনাশ বলিল, "বউ, ব্যাপার কি? জ্বর হয়েছে ব'লে তুমি কলেজ থেকে ট্যাক্সি করে চলে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ জ্বর হল কেমন ক'রে? আর তাই হয়েছিল যদি ত গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলে কেন বউ?"

"জ্বর হয়নি।"

"কিন্তু দারোয়ান যে বল্লে!"

"সে তাই মনে করেছিল বটে! জ্বর আমার হয়নি।"

"তবে? হঠাৎ এই অবেলায় স্নান—আর, তাড়াতাড়ি কালীঘাটে পূজো দিতে যাওয়া—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে বউ!"

সুষমা বলিল, "পরে বলবো।"

"কখন বলবে?"

"রাত্রে। এখন এই সব ঝি চাকর ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটু নিরিবিলি না হলে তোমায় সব কথা খুলে বলতে পারবো না।"

অবিনাশ বলিল, "তুমি যে আমায় বড়ই দুশ্চিন্তায় ফেল্লে সুষমা। কোনও অমঙ্গল, কোনও অশুভ ঘটেছে কি ?"

হ্যাঁ—না।"

"ঘটেওছে, ঘটেওনি ? কি বলছ তুমি ? বিস্তারিত না পার, সংক্ষেপে বল।"

সুষমা বলিল, "সংক্ষেপেই বলছি—আমি আর ও কলেজে পড়বো না। সব কথা শুনলে, তুমিও আমায় আর সেখানে যেতে বলবে না। এখনও আমার মনটা বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত রয়েছে—আর কোনও কথা এখন তুমি আমায় জিজ্ঞেস কোর না গো তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"—বলিয়া, প্রায় সাশ্রু নয়নে সুষমা সেখান হইতে প্রস্থান করিল। রান্নাঘরে গিয়া স্বামীর চায়ের উদ্যোগ করিতে বসিল।

রাত্রে সুষমা স্বামীর কাছে সকল কথাই বলিল—"তোমায় ত আমি আগেই বলেছিলাম, সরোজ রায় লোকটা কী রকম ভাবে আমার পানে চায়—দেখে আমার ভারি রাগ হয়। তুমি আমাকে বলেছিলে, ও সব কিছু নয়, ও সব আমার মনের ভ্রম।—খুকীর অসুখের জন্যে সাত দিন কলেজে যাইনি ত! আজ তুমি আমায় সিঁড়ির কাছে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলে। আমি উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, ক্লাস সব শূন্য। দারোয়ান বল্লে, আজ রাসপূর্ণিমার ছুটি আপনি কি জানতেন না ?—আমি বল্লাম, না, আমি ত এক হপ্তা কলেজে আসিনি। বলে, আমি বারান্দায় গেলাম, তোমায় যদি

রাস্তায় দেখতে পাই ত তোমায় ডাকবো ব'লে। রেলিংএর উপর ঝুঁকে দেখলাম তুমি প্রায় কলুটোলা ষ্টীটের কাছে গিয়ে পৌঁছেছ—ডাকলে তুমি শুনতে পাবে না। কলেজেই অপেক্ষা করবো—না একটা ট্যাক্সি আনিয়ে বাড়ী ফিরবো, দাঁড়িয়ে ভাবছি—এমন সময় দেখি, সরোজ রায় ক্লাস ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে—'সুষমা, শুনে যাও।'—'আজ ছুটি আমি জানতাম না স্যার'—ব'লে আমি সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হলাম। সরোজ রায় কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এ ক'দিন আসনি কেন ?' বল্লাম, 'আসতে পারিনি স্যার—আমার খুকীর অসুখ হয়েছিল।'—'কি অসুখ হয়েছিল ?'—বলতে বলতে সরোজ আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, খুকীর মা অসুখ হয়েছিল, আমি সংক্ষেপে বল্লাম। শূন্য ক্লাস ঘরে আমার গা ছম্‌ছম্ করছিল, কোনও রকমে কথাটা সেরে পালাতে পারলে বাঁচি। সরোজ বল্লে—'এখন খুকী ভাল হয়েছে ত ? যাক্। কিন্তু তুমি যে কামাই করলে, ছুটি নিয়েছিলে ?'—বল্লাম, 'আজ্ঞে না, ছুটি নিতে হয় তা আমি জানতাম না স্যার।' সরোজ বল্লে, 'কামাই করার জন্যে তোমার জরিমানা হবে তা জান ?'—বল্লাম, 'তা যদি হয় ত দেবো স্যার।'—সরোজ বল্লে, 'দেবে ? দেবে ?'—তার কথার স্বরে আর তার ভঙ্গি দেখে আমার গা কেঁপে উঠলো। চলে আসবার জন্যে আমি ফিরে দাঁড়াতেই—সরোজ পিছন থেকে হঠাৎ আমার গলা জ'ড়িয়ে—এই তোমার জরিমানা—ব'লে—না গো—আর আমি বলতে পারবো না।"—বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া, হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাগে অবিনাশের সর্ব্বশরীর দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল। স্ত্রীর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া, তাহাকে আদর করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেঁদনা—যা হবার তা হয়ে গেছে। সে দুর্ব্বৃত্তকে তার উপযুক্ত শাস্তি আমি দেবো। তারপর, তুমি কি করলে তাই আমায় বল।"

সুষমা ক্রমে স্বামীর বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে, ঠাস্ করে তার গালে এক চড় ক'ষয়ে দিলাম।—চড় মেরে, আমার নিজেরই হাত ঝন্‌ঝন্ করতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে দারোয়ানকে বল্লাম, 'দারোয়ান আমায় শীগ্‌গির একখানা ট্যাক্সি ডেকে দাও আমি বাড়ী যাব।'—আমি তখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। দারোয়ান বল্লে, 'বোখার হুয়া মাইজী?'—আমি বল্লাম 'হ্যাঁ বাবা, বহুৎ বোখার হুয়া। দাঁড়াতে পারছি নে।' সে নিজের টুল ছেড়ে উঠে বল্লে, 'আঁখভি বহুৎ লাল হুয়া। আপ হিঁয়া বৈঠিয়ে মাইজী, হাম অভি টেক্সি বোলায়ে দেতে হাঁয়।'—ট্যাক্সিতে বসে বসেই স্থির করেছিলাম, এ অপবিত্র দেহ নিয়ে বাড়ী ঢুকে স্বামীর মন্দির কলুষিত করবো না—গঙ্গাস্নান ক'রে সতী শিরোমণি কালীমাকে প্রণাম ক'রে, তাঁর প্রসাদী সিন্দূর মাথায় প'রে পবিত্র হয়ে তবে বাড়ী ঢুকবো।"—বলিয়া সুষমা নীরব হইল। স্বামীর কোলে মাথা দিয়া, বিছানার উপর দেহ এলাইয়া দিল। অবিনাশও নীরবে স্ত্রীর মাথায়, কপালে, বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্বামীর এই নীরব সান্ত্বনায় কিয়ৎক্ষণ পরে সুষমা অনেকটা শান্ত হইল। ক্রমে সে উঠিয়া বসিল।

"আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সুষমা, এর উপযুক্ত প্রতিফল সেই পাষণ্ডকে আমি দেবো, এবং কালই।—তুমি শান্ত হও – যা হয়েছে তা ভুলে যেতে চেষ্টা কর।"—বলিয়া অবিনাশ স্ত্রীকে চুম্বন করিতে উদ্যত হইল।

সুষমা বাধা দিয়া বলিল, "এখন না—গঙ্গাস্নান ক'রে গঙ্গা মৃত্তিকা দিয়ে এই ঠোঁট দুটো বেশ করে আমি মেজে ফেলেছি। তারপর, মা কালীর মন্দিরের চৌকাঠের উপরও ঠোঁট দুটো বুলিয়েছি। কিন্তু এখনও আমার মনের গ্লানি যায় নি – তোমার পায়ের ধূলো দাও, তাই আমি ঠোঁটে মেখে এ দুটোকে পবিত্র ক'রে নিই।"—বলিয়া সুষমা স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া, নিজ মস্তকে ঠেকাইয়া তাহাতে চুম্বন করিতে লাগিল।

পরদিন "নবরশ্মি" আফিসে প্রবেশ করিয়া ক্রোধোন্মত্ত অবিনাশ সরোজকে সড়াং সড়াং করিয়া কয়েক ঘা বেত মারিয়াছিল, সে কথা লইয়া সাহিত্যিক মহলে কিরূপ হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কারণ কেহই জানিতে পারে নাই। 'নবরশ্মি'র তরফ হইতে ইহাই প্রচার করা হইয়াছিল যে, অবিনাশ বাবুর প্রেরিত কোনও প্রবন্ধ অমনোনীত করার জন্যই নিরীহ সম্পাদক মহাশয় ওরূপভাবে তাঁহার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

পোষ্ট মাষ্টার

—— —— * —— ——

খড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোষ্ট আফিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাত ভাঙ্গা চেয়ারের উপর, বেগুনে রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কায করিতেছে, ওই এখানকার পোষ্টমাষ্টার বা ডাকবাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিতেই, বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনা গেল; 'রাণার' ডাক লইয়া আসিয়াছে। 'রাণার' প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাকবাবু ব্যাগের শিলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার তখন 'তামুক' খাইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

আফিস গৃহ এখন জনশূন্য। পিয়নেরা রান্না খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটিবে, এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি, মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটিয়া বিমল উহা টেবিলের উপর উবুড় করিয়া ধরিল। চিঠিপত্র পার্শেল প্রভৃতির সঙ্গে, একটা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেরাজের মধ্যে রাখিল। (ইহা সে বাসায় লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুলিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতা-

গুলির রসাস্বাদন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।) তার পর, চিঠির গাদা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাব মধ্য হইতে ৪।৫ খানি বাছিয়া লইয়া, দেরাজের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষরে, স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসায় লইয়া গিয়া, জল দিয়া খুলিয়া পাঠ করিবে;—শুধু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াই মনে করে; কারণ, চিঠিগুলি সে নষ্ট করে না, আবার জুড়িয়া, পরদিন ছাপ মোহর লাগাইয়া, বিলির জন্য পিয়নদের দিয়া থাকে। ছয়মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আসিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপহরণ করে;—এটা তাহার একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাড়ে দশটা বাজিল; পিয়নেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে আমরা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।

বিমলের নিবাস যশোর জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামে। তথায় একটি হাইস্কুল আছে—সেই স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে

দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার গোঁফদাড়ি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল "বিমল যে দিন পাস হবে, সেদিন পূবের সূর্য্যি পশ্চিম দিকে উঠবে।" এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রামের যত বকাটে ছোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সখের থিয়েটার দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা, এবং গঞ্জিকা সেবন ত অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল, ইদানীং থিয়েটরের রিহার্সালে যে বোতলও গোপনে আমদানী হইত, তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটিয়া গেল; গেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, বিমল তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়াছে,—অথচ সূর্য্যদেব গ্রামের লোকের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও খাতিরই করিলেন না।

বিমল ছোকরাটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তাহার মন্দস্বভাব জন্য আজিও বিবাহ হয় নাই। সংসারে তাহার মা ও জেঠাইমা (উভয়েই বিধবা), একটি ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং দুইটী জ্যেঠতুতো ভাই বর্ত্তমান। বড়টি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে সামান্য বেতনে সুমারনবীশের কর্ম্ম করে—ছোট ভাই দুটী স্কুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল—সামান্য যাহা জোৎজমা আছে তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে, ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল; তাঁহারই সুপারিশে সে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম

পায়। আলিপুরের হেড আপিসে বৎসর খানেক শিক্ষানবিশী ও একটিনি করিয়া, আজ ছয়মাস হইল সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসিয়াছে।

হেড আপিসে থাকিতে পাঁচজন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না। এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিয়নেরা আজ্ঞাকারী, খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ, এমন কি পল্লীগ্রাম হইলেও এখানে "বিলাতী" পাওয়া যায়—তবে সোডা পাওয়া যায় না, জল মিশাইয়া খাইতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

৩

পিয়নগণ স্ব স্ব ব্যাগ ভ'রিয়া পত্রাদি লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলে, বিমল অপহৃত মাসিকপত্রখানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তালাবন্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, "বামুন মা, রান্নার কত দূর ?"

একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "রান্না আমার শেষ হয়েছে, তুমি চান ক'রে এস বাবা।" ইঁহার বাড়ী এই পাড়াতেই, বড় গরীব, মাত্র চারিটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া, চিঠিগুলি ও মাসিক-পত্রখানি বালিসের

নীচে গুঁজিয়া; কোট প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তেল ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান গামছা ও বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া জামা পরিয়া, আর্সি চিরুণী ও বুরুষ লইয়া পরিপাটি রূপে নিজ কেশসংস্কার করিল। তারপর রান্না ঘরের বারান্দায় বিছানো আসনখানির উপর বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া "বামুন মা" যখন চলিয়া গেলেন তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পাণ চিবাইতে চিবাইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল। এক গেলাস জল ও একখানি ছুরী লইয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) ছোট টেবিল খানির উপর রাখিয়া, বিছানায় বসিয়া, বালিসের তলা হইতে মাসিক পত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙ্গুল ভিজাইয়া, প্রত্যেক চিঠির মুখে বেশ করিয়া বুলাইয়া সেগুলি সারবন্দি টেবিলের উপর রাখিয়া মাসিক পত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির মুখের জল শুষ্ক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির মুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিক পত্রখানি রাখিয়া ছুরীর ফলা চিঠির মুখে ঢুকাইয়া উল্টাদিকের চাপ দিয়া একে একে চিঠিগুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আজ

বউনি হল মন্দ নয়!" নোটখানি বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া চিঠির ভাঁজ খুলিল। প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে চিঠিখানি পড়তে লাগিল। কলিকাতা প্রবাসী বিরহী স্বামী স্বীয় বিরহ যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া তাহার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধরিয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে—সে জন্য দিন-গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া, খোকার দুধ খরচের জন্য ১০টি টাকা পাঠাইতেছে। এ ব্যক্তির আরও কয়েকখানি পত্র ইতিপূর্ব্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতায় চাকরির জন্য উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাখিয়া, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল। "পূজনীয়া পিসিমা!" সম্বোধন দেখিয়া—"ধুত্তোর" বলিয়া সক্রোধে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে বিমল পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের পূর্ব্বকথা কিছু কিছু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চারুশীলা—সে বিধবা বোধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপুর গ্রামের দক্ষিণে রসুলপুরে তাহার বসতি—খুব সম্ভব ঐ স্থানে তাহার শ্বশুরালয়। তাহার পিত্রালয় কলিকাতায়;—কলিকাতা নিবাসী এই পত্র লেখকের সহিত তাহার প্রণয় সংঘটিত হয়। পত্র লেখককে পত্রশেষে কখনও নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না—সে সহি করে—"তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী," "তোমার ভালবাসা,"—"তোমার সে"—এইরূপ সব মাথামুণ্ড। বিগত ৩।৪

মাস হইতে ইহাদের এইরূপ প্রেমপত্র চলিতেছে—তবে, মেয়েটির লেখা চিঠি বিমল কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই,—নাম না জানাতে, স্বওয়ানা চিঠিগুলির মধ্য হইতে সেখানি বাছিয়া বাহির করা শক্ত বলিয়াও বটে ; এবং সময় পাওয়া যায় না বলিয়াও বটে,—কারণ ভিন্নগ্রামের ডাক বাক্স হইতে পিয়নেরা চিঠি ঝাড়িয়া আনিবার সময় ডাকঘরে অনেক লোক জন থাকে, ছাপ মোহর দিয়া ব্যাগ ভর্ত্তি করিবার ধুম পড়িয়া যায়।

বিমল সাগ্রহে পত্র খানি পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা

২২শে অগ্রহায়ণ

আমার হৃদয়েশ্বরী

গতকল্য তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছি—তাহা তুমি পাইয়া থাকিবে। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, আমি আগামী শনিবার দিন গিয়া তোমায় লইয়া অসিব। কিন্তু শনিবারে যাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন অর্থাৎ রবিবার দিন আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তুমি পূর্ব্ব পরামর্শ মত, রাত্রি ঠিক ১২টার সময় তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে সেই শিবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি মন্দিরের পার্শ্বস্থ সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় লুকাইয়া থাকিব ; এবং তুমি আসামাত্র তোমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিব। যান বাহনাদির কিরূপ

বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারি না—হয়ত হাঁটিয়াই উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আইন অনুসারে আমাদের বিবাহের সমস্ত আয়োজন আমি করিয়া রাখিয়াছি—পুরোহিতও ঠিক হইয়াছে—সোমবার দিন আমি যথাশাস্ত্র তোমার পাণিগ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আমি উকীল ব্যারিষ্টারগণের পরামর্শও লইয়াছি। তাঁহারা বলেন, যদি তোমার শ্বশুরকুলের কেহ, এই লইয়া আমার উপর মামলা মোকদ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তবে তোমার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইয়াছে এবং স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই কেহ আর আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। সেইজন্য আমি জন্মমৃত্যু রেজেষ্টারি আপিস হইতে তোমার জন্মদিনের সার্টিফিকেটের নকল পর্য্যন্ত আদায় করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং সকল দিকেই আটঘাট বাঁধা রহিল। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে আমি রওয়ানা হইয়া ষ্টেশনে নামিয়া, রাত্রি দশটার মধ্যেই তোমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিব। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, গৃহের বাহির হইও—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার শূন্য গৃহে আসিয়া তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও—আমার শূন্য হৃদয়ে বসিয়া আমায় চিরসুখী কর। ইতি

তোমার (মন) চোর।

এই পত্রখানি পড়িয়া বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল—কি

চমৎকার! এ যে রীতিমত একটা নভেলী ব্যাপার! বাঃ—বাঃ —ক্যা মজাদার! ক্যা তোফা। বাহ্‌বা চারুশীলা—ব্রাভো! জিতা রহো বাবা—থ্রি চিয়ার্স ফর্‌ চারুশীলা। বেশ বেশ—বরের কাছে তুমি যাবে—মাইকেল ত বিধানই দিয়ে গেছে—"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে"—ব্রজাঙ্গনা কাব্য দেখহ! গড্‌ ব্লেস্‌ দি হ্যাপি পেয়ার—তোমাদের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করবে না বাবা? লুচি খেয়ে আসতাম!

অতঃপর বিমল বাকী পত্র দুইখানি প'ড়িয়া দেখিল; এ দুই-খানিই মামুলি স্বামীর মামুলি প্রেমের চিঠি—তাহাতে প্রেমের চেয়ে ঘরকন্নার কথাই বেশী—কোনও বিশেষত্ব নাই। বিমল এই ছয় মাসের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সহস্রাধিক প্রেমপত্র প'ড়িয়াছে, সে জানে বৈধ প্রেমের চিঠি অপেক্ষা, অবৈধ প্রেমের চিঠিতেই "মজা' বেশী থাকে; পত্রগুলি আবার জুড়িয়া রাখিয়া বিমল মাসিক পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে উহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সে তখন পাশ ফিরিয়া, পাশের বালিসে প দিয়া আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

৪

অপরাহ্ণকালে বিভিন্ন গ্রাম হইতে পিয়নেরা ফিরিয়া আসিলে বিমল তাহাদের নিকট হইতে মনি অর্ডার রেজেষ্টারি প্রভৃতির রসিদ বুঝিয়া লইয়া, খাতা পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কার্য্যশেষ হইলে,

ভৃত্যকে বলিল, "ওরে, যা দেখি, হরেন সার দোকান থেকে এক বোতল বিহাইব নিয়ে আয়। চাদরের ভেতর বেশ করে লুকিয়ে আন্‌বি—বুঝেছিস্? আর, করিমদ্দিকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাস।"—বলিয়া বিমল, সরকারী তহবিল হইতে ভৃত্যের হস্তে ছয়টি টাকা দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পিয়ন করিমদ্দি সেখ আসিয়া বলিল, "হুজুর ডেকেছেন?"

বিমল বলিল, "হ্যাঁ? আজ একটা ফাউলের কারি বানিয়ে দিতে পারবে হে শেখের পো?"

করিম বলিল, "কেন পারবো না হুজুর?"

"আচ্ছা—এই টাকা নাও। বেশ মোটা তাজা দেখে একটা মুরগী কিনে এনো। বেশ করে' লঙ্কাবাঁটা দিও—আমরা বাঙ্গাল মানুষ, ঝালটা কিছু বেশী খাই।"—বলিয়া বিমল ক্যাশ হইতে তাহাকেও একটি টাকা দিল।

কাযকর্ম্ম শেষ হইলে, ক্যাশ হইতে আর তিনটি টাকা লইয়া, দ্বিপ্রহরে লব্ধ সেই দশ টাকার নোটখানি ক্যাশে রাখিয়া ক্যাশ পূরণ করিল। ক্যাশ মিলাইয়া তাহা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, আপিস ঘরে চাবি দিয়া বিমল বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বামুন মাকে দেখিয়া বলিল, "মা, আজ শরীরটে কেমন ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ করছে, আজ রাত্রে ভাতটা আর খাবনা, খানকতক পরোটা ভেজে রেখে যেও। তরকারী ফরকারী বেশী কিছু দরকার নেই খানকতক আলুভাজা হলেই চলবে।"—বলিয়া সে মুখহাত

ধুইতে চলিয়া গেল। (মাঝে মাঝে—বিশেষ, বেতন পাইবার পর দুই চারি দিন বিমলের এরূপ গা ম্যাজ ম্যাজ করিয়া থাকে—এবং রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে লুচি বা পরোটা ফরমাস করে।) মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া বিমল এক পেয়ালা চা পান করিয়া, পাণ মুখে দিয়া ঘোষেদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে গেল—প্রত্যহই এইরূপ যায়।

রাত্রি ৮টা বাজিতেই বামুন মা পরোটা ও আলুভাজা বিমলের শয়ন ঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিমল বাসায় আসিয়া রামচরণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "করিমদ্দি এসেছিল?"

রামচরণ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ রেখে গেছে।"—বিমল দেখিল একটি এনামেলের বড় বাটীতে তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফাউল কারি ঢাকা রহিয়াছে।

বিমল তখন ভৃত্যকে রাত্রের মত বিদায় দিয়া, সদর দরজা বন্ধ করিয়া, শয়ন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেওয়ালে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল – তাহার আলো বাড়াইয়া দিয়া যথাস্থান হইতে বোতল গ্লাস এবং 'কাক ইস্কুরু' বাহির করিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) টেবিলের উপর রাখিল ; জুতা মোজা ত্যাগ করিয়া, বিছানার ধারে বসিয়া বোতলটি খুলিয়া ফেলিল।

এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালাটি পাড়িয়া তাহাতে ছড়ি দিতে লাগিল। একটা গৎ বাজাইয়া আর এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালা যথাস্থানে রাখিয়া ভাবিল, সেই মজার চিঠিখানা আর একবার

পড়িতে হইবে। দেওয়াল আলমারি খুলিয়া, চিঠিগুলি বাহির করিয়া, চারুশীলার খানি বাছিয়া লইয়া বলিল—"এঃ জুড়ে ফেলেছি যে দেখছি। কুছ পরোয়া নেই—ফের খুলবো!"—বলিয়া টলিতে টলিতে বিছানায় আসিয়া বসিল। চিঠিখানিকে সামনে ধরিয়া বলিল, "কি চাঁদ, জল খাবে? না ব্র্যাণ্ডি?"—বলিয়া গেলাসে খানিক ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া, আঙুলে একটু লইয়া চিঠির মুখ ভিজাইয়া বলিল, "যা বেটা, তোর চিঠিজন্ম সাথক হ'য়ে গেল।" পরে ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে চেষ্টা করিতেই উহার মুখ ছিঁড়িয়া গেল। চিঠিখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে গেলি? কাল বিলি হবি কি ক'রে রে শালা?"—বলিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া, খাম খানা ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল "জাহন্নামে যাও!" চিঠি খুলিয়া পড়িল—"আমার হৃদয়েশ্বরী!" চিঠি রাখিয়া নিজ বক্ষে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল—"হৃদয়েশ্বরী! -হৃদয় জ্বলে গেল,— পুড়ে গেল,- খাক্ হয়ে গেল! আর একটু খাই"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, গেলাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জিহ্বা তখন তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেশা হইলে, সে আর 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না—স স্থানে 'ছ' বলিত। একটি একটি কথায় জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু - ছনিবারে,—যাওয়ার ছুবিধা করিতে—পারিলাম না। পরদিন—পরদিন—অর্থাৎ রবিবারে—আমি নিচ্চয় যাইব তাহাতে কোন ছন্দেহ নাই। তুমি—পূর্ব্ব পরামর্ছ মত—রাত্রি ঠিক ১২টার

ছময়—তোমাদের বাড়ীর পচ্চিমে ছেই ছিবমন্দিরের ছম্মুখে আছিয়া দাঁড়াইবে।"

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল। অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি! খাম খানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। আগেকার চিঠি মত—তুমি ছনিবারে রাত বারটায় এছে ছিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াবে ত? তার আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে ছুয়ে পড়বে। কিন্তু ছে ত হায় আছবে না। অল্‌রাইট—আমি যাব আমি গিয়ে তোমায় বল্‌বো—

উঠ উঠ হে ছুন্দরী,
তব পদছ্‌পচ্ছ যোগ্য নহে এ ধরণী!
তুমি কেন ধূলায় পতিত?

তুমি চল—আমার ছঙ্গে চল। চল ছখি, তুমি আমার হৃদয়েচ্ছরী হবে। হৃদয়ের চ্ছরী—না ছুরি? হৃদয়ের ছুরি হোয়ো না দোহাই বাবা ছাতদোহাই তোমার!"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, আপন রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া বিমল একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া পড়িতে বসিল। পড়িল—

"আমার ছুন্য গৃহে আছিয়া, তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও। আমার ছুন্য হৃদয়ে বছিয়া আমায় চিরছুখী কর। ভগবানের নাম ছ্মরণ করিয়া গৃহের বাহির হইও—আছা করি তাঁহার আছীর্ব্বাদে

আমাদের মিলনের পথ হইতে ছকল বাধাবিঘ্ন অপছারিত হইবে।"

চিঠি রাখিয়া বিমল বলিতে লাগিল—"উত্তম কথা!—কিন্তু দাদা, তোমারই হৃদয় কি ছুন্য? আমারও যে তাই ভাই। আমার ছব ছুন্য ছব ছুন্য। আমার হৃদয় ছুন্য—প্রেম নেই; গৃহ ছুন্য—ইছ্‌তিরী নেই—বাক্‌ছো ছুন্য, টাকা নেই! আমার ছব ছুন্য—মহাব্যোম—ব্যোম ভোলানাথ—ছনিবার রাত বারটায় আমি যাব—তোমার মন্দিরের কাছে বটগাছের নীচে আমি লুকিয়ে থাকবো—চারু-ছীলাকে নিয়ে এছে, আমার ছুন্য গৃহ ছুন্য হৃদয় পূর্ণ করবো। তুমি হচ্চ বিঘ্ন বিনাছনের বাপ—তাকে ছাবধান করে দিও—যদি কোনও বাধা বিঘ্ন ঘটে—তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্তুরকে এর জন্যে রেছ্‌পানছিবিল হতে হবে—এই ছাপ্‌ কথা আমি বলে রাখলাম।"—বলিয়া বিমল বীররসের সহিত বিছানায় এক মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, চক্ষু খুলিল। আর খানিকটা সুরা ঢালিয়া, জল মিশাইয়া পান করিয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল, "লেডিজ এণ্ড জেনেলমেন, তোমরা ভাবছো—মাতালছ্য নানাভঙ্গি—এখন এ বেটা মদের খেয়ালে এই ছব বলছে—কাল এছব কিছুই মনে থাকবে না। তা নয় তা নয়—হাম যায়েঙ্গা।—আলবৎ যায়েঙ্গা।—ঢেকে যায়েঙ্গা—আমায় চিনতে পারবে না। তার পর এই বাছায় এনে তাকে বন্দিনী। আদরে যত্নে মিছ্‌টি কথায় তিরি-লোককে বছীভূত করতে কতক্ষণ?—আর আমার এ চেহারাটাও কি কোনও কাযে লাগবে না?—এখন একটু ছোয়া যাক।"—বলিয়া

মাতাল বিছানায় দেহ লুটাইয়া দিয়া, নিদ্রা ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল। কোথায় রহিল তার পরোটা—আর কোথায় রহিল তার সাধের ফাউলকারি!

৫

খামের উপর শ্রীমতী চারুশীলা দাসী ঠিকানা লেখা থাকিলেও, এবং রসুলপুর গ্রামে যথার্থই একজন চারুশীলা দাসী থাকিলেও, পত্রখানি তাহার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। তাহার নামেই পত্র আসে বটে, কিন্তু পত্র না খুলিয়াই, চারুশীলা সেখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া পাশের বাড়ীতে তাহার প্রিয়সখী বনলতাকে দিয়া আসে। ইহাই গোপন বন্দোবস্ত। সব কথা তবে খুলিয়াই বলি।

বনলতা, বনে জন্মগ্রহণ করে নাই—খাস কলিকাতা সহরে তাহার মাতুলালয়ে জন্মিয়াছিল। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া বনলতা মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতে থাকে। মামা বড়লোক ছিলেন, নিজের মেয়েদের সঙ্গে বনলতাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় একটি যুবক কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত—তাহার সহিত বনলতার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরেই সেই হতভাগ্য যুবক কাল-কবলিত হয়। বনলতার মামা, অভাগিনী ভাগিনেয়ীকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। গত বৎসর উইল করিয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া, ইহধাম হইতে মহা-প্রস্থান করিয়াছেন।

যে লোকটি "তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী" "তোমার মনচোর" ইত্যাদি বলিয়া চিঠি সহি করে, তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ইঁহাদেরই জ্ঞাতি। সে লোকটিও সুশিক্ষিত এবং উদারমতাবলম্বী। ব্রহ্মদেশে সেগুন কাঠের তাহার বিস্তৃত কারবার আছে—কলিকাতায় তাহার ব্র্যাঞ্চ আছে। বনলতার মামার শ্রাদ্ধ উপলক্ষেই বর্মা হইতে নরেন কলিকাতায় আসে এবং বিধবা বনলতার সহিত পরিচিত হয়। তাহাদের বাড়ী ভিন্ন হইলেও, প্রত্যহই এ বাড়ীতে সে আসিতে লাগিল এবং এসব ক্ষেত্রে যাহা হয়—প্রথমে আঁখি মজিল, তারপর মন মজিল। ব্যাপার অবগত হইয়া বনলতার মামাতো ভাইয়েরা, নরেনের সহিত তাহার বিধবা-বিবাহ দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই খবর কাকমুখে রসুলপুর গ্রামেও আসিয়া পৌছিল। উইলের সংবাদও পূর্ব্বে পৌছিয়াছিল। বনলতার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া, বনলতায় মামাতো ভাইদের উপর উকিলের চিঠি দিয়া, মহা হাঙ্গামা করিয়া, বিধবা পুত্রবধূকে "উদ্ধার" করিয়া আনেন।

রসুলপুরে আনিয়া বনলতা প্রথমে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। মাস খানেক পরে পাশের বাড়ীর সমবয়সী চারুশীলার সহিত তাহার সখিত্ব জন্মে। চারু তার স্বামীর অভিমতে, বনলতার সহিত তাহার হস্তাকাঙ্ক্ষীর পত্রবিনিময়ে এইভাবে সহায়তা করিতে সম্মত হয়।

অপহৃত পত্রখানিতে লেখা ছিল, "গত কল্য তোমায় পত্র লিখিয়াছি যে, শনিবার রাত্রে গিয়া তোমায় লইয়া আসিব।" সে পত্রখানি যথাসময়ে চারুর হস্তগত হয়, এবং যথানিয়মে বনলতাকে সেখানি সে দিয়াও আসে। অন্যান্য পত্র, বনলতা পড়িয়া ছিঁড়িয়া

ফেলিত। কিন্তু এ পত্রখানিতে সময় তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিল বলিয়া, বাক্সে লুকাইয়া রাখে। বনলতার শ্বাশুড়ী তাহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে তিনি তাহার বাক্স পেটরা গোপনে খানাতল্লাসীও করিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত "দোষজনক" কিছুই পান নাই। এই পত্রখানি পৌঁছিবার পর দিন, দ্বিপ্রহরে বনলতা চারুশীলাদের বাড়ী গিয়াছিল—সেই সুযোগে তাহার শ্বাশুড়ী অন্য চাবি দিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, পত্রখানি পাঠ করেন এবং স্বামীকে দেখান। স্বামী বলেন, "আচ্ছা, আসুক না পাজি, তাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যাবে।"

শনিবার দিন বনলতার শ্বশুর তাঁহার দুইজন বন্ধুকে রাত্রে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শ্বাশুড়ী, নানা অছিলায়, রান্না-বান্নায় বিলম্ব করিলেন। অতিথিদ্বয়ের আহার যখন শেষ হইল, রাত্রি তখন ১১টা।

অন্য দিন রাত্রি ১০টা না বাজিতেই বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ বনলতা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিন্তু বাড়ীর সকলে জাগিয়া; শ্বাশুড়ী-ননদেরা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। ওদিকে বৈঠকখানা হইতে ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বনলতার শ্বশুর, তাঁহার বন্ধুদ্বয় সহ, লাঠি ও দড়ি সঙ্গে লইয়া, শিব-মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই, ওভারকোট গায়ে, মাথায় মুখে কম্ফাটার জড়ানো, বিমল ধীরে ধীরে আসিয়া বটবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায়

দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই তিন জন লোক আসিয়া তাহার মাথায়, পার্শ্বে, বুকে, পদদ্বয়ে লাঠি, কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি মারিতে মারিতে তাহাকে মাটীতে পাড়িয়া ফেলিল। প্রহারের চোটে তৎপূর্ব্বেই বিমল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল।

লোক তিনজন তখন, অচেতন বিমলের হস্তপদ উত্তমরূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এক ব্যক্তি কহিল, "বেটা বেঁচে আছে ত? না মরেছে?"

অপর ব্যক্তি তাহার নাকের কাছে হাত দিয়া বলিল, "না—নিশ্বাস বেশ পড়ছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এখন, একে কি করা যায় বল দেখি? এইখানেই কি পড়ে থাকবে?"

"না না—আমাদের বাড়ীর কাছে কেন? শেষকালে কি কোনও পুলিস হাঙ্গামায় পড়বো?"

"তবে চল বেটাকে নিয়ে খানিক দূরে কোথাও ফেলে রেখে আসা যাক।"

"দেশলাইটে জ্বাল ত, লোকটা কে, দেখি।"

এক ব্যক্তি দেশলাই জ্বালিল। তিন জনেই তখন বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে মহেশপুরের পোষ্ট মাষ্টার!"

দেশলাই পুড়িয়া গেল। আবার যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

তখন তিন জনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। "এ বেটাই বা এখানে এল কেন? যে বেটার আসবার কথা সেই বা এল না কেন?"

"সে যা হোক তা হোক—এখন চল একে মহেশপুরে পোষ্ট আপিসের বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে আসা যাক।"

তিনজনে তখন বিমলের অচেতন দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। পল্লীগ্রামের পথ—রাত্রি দ্বিপ্রহর—রাস্তায় আলো নাই—জনমানবের সঞ্চার নাই।

৬

শীতে, খোলা বারান্দায় পড়িয়া থাকিয়া, ঘণ্টা দুই পরেই বিমলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে সেই আবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া, নানারূপ উপায় ফন্দি চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। একজন পিয়নকে সেই দিকেঁ আসিতে দেখিয়া, বিমল ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল।

পিয়ন আসিয়া বলিল, "বাবু, ব্যাপার কি ?"

বিমল চিঁচিঁ করিয়া বলিল, "ডাকাতি রে, ডাকাতি ! আগে আমার প্রাণটা বাঁচা।"

সে ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া অন্যান্য পিয়নকে ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বিমলের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিল।

বিমল বলিল, "আমার বুক পকেট থেকে চাবি নে। ডাকঘর খোল্, খুলে, মেঝের উপর আমায় শুইয়ে দিয়ে থানায় খবর দিগে যা।"

পিয়নেরা তাহাই করিল। বিমল কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিল, "সব পিয়ন যা। দারোগা প্রথমে তোদেরই জবানবন্দি নেবে কিনা !"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবো হুজুর ?"

"যা জানিস - যা দেখেছিস—সবই বল্‌বি।"

পিয়নগণ যখন চলিয়া গেল তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে। বিমল টলিতে টলিতে উঠিয়া, সরকারী লোহার সিন্দুক খুলিল। তাহার মধ্যে নোটে টাকায় ৫৪২৲ ছিল—সেগুলি সমস্ত বাহির করিয়া, রুমালে বাঁধিয়া, বাসায় গিয়া নিজ ট্রাঙ্কে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়া, ডাকঘরের মেঝেতে পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিল।

৭

দুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে কাগজে ছাপা হইল—

ভীষণ ডাকাতী

পোষ্ট আফিস লুট !

বিগত শনিবার রাত্রে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামের পোষ্ট আফিসে একটি ভয়ানক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাত্রি ১১টার সময় ডাকঘরে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিলেন, পিয়নেরা তৎপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। ৫।৬ জন যুবক হঠাৎ ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রিভলবার বাহির করিয়া বলে—"খবর্দ্দার চীৎকার করিও না, গুলি করিব। লোহার সিন্দুকের চাবি দাও।" ইহাতে পোষ্ট মাষ্টার বলেন, "তা কখনই দিব না—প্রাণ দিব তবু সরকারের টাকা দিব না।" একজন যুবক তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাঁট দিয়া

বিমল বাবুর মস্তকে সজোরে প্রহার করে। অপর যুবকগণ তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার বুকে বসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তার পর হস্তপদাদি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া চাবি খুঁজিতে থাকে। চাবি পাইয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া পূর্ব্বদিনের ক্যাশ ৫৪২৲ লইয়া, সিন্দুক বন্ধ করণান্তর পোষ্ট-মাষ্টারকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া শোয়াইয়া দেয়। অফিস ঘরে তালাবন্ধ করিয়া, চাবির গোছা পোষ্ট মাষ্টারের পকেটেই ভরিয়া দিয়া তাহারা পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতগণের মুখে কালো মুখস, গায়ে কালো কোট, পায়ে বুটজুতা ছিল, এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেছিল। এই ডাকাতী সম্পর্কে গতকল্য কলিকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে এবং পুলিস, তিনজন যুবককে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

*　　　*　　　*

শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতেরা কেহই ধরা পড়ে নাই। বিমল আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

রবিবার রাত্রে নরেন যথাস্থানে আসিয়া, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বনলতা পত্রে এখানকার সমস্ত ঘটনা জানাইয়াছিল। মাস খানেক পরে, একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে, বনলতা পলায়ন করিয়া, পদব্রজে রেলের ষ্টেশনে গিয়া নরেনের সঙ্গে মিলিত

হয় এবং উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া যায়। তার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া থানায় এবং উকিল বাড়ীতে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। নরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

দাম্পত্য প্রণয়

পল্লীগ্রামে পাশার আড্ডা বসিয়াছে। যাঁহারা খেলিতেছেন, তাঁহারা একমনেই খেলিতেছেন। অপর যাঁহারা জমায়েৎ হইতেছেন, তাঁহারা গুড়ুক ফুঁকিতেছেন ও নানাবিধ গল্প করিতেছেন। এমন সময় প্রৌঢ়বয়স্ক সীতানাথ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সভায় আসন গ্রহণ করিয়া বেণী বসুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনেছ বোসজা? এবার তারকেশ্বরে যে ভারি ধুম।"

"চড়ক মেলায় না কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। মোহান্ত এবার কাশী থেকে বাই, কলকাতা থেকে খ্যাম্‌টা নাচ আনাচ্চে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা ত আছেই—আবার কলকাতায় নাকি এক রকম ছিয়াচার উঠেছে, তাও এক দল আসবে। পশ্চিম থেকে ভূরে খাঁ চাঁদ খাঁ এসেছে, তারা ভোজবাজি দেখাবে—সে নাকি একেবারে আশ্চর্য্য কাণ্ড।"

বসুজ বলিলেন, "বটে! এবার তা হ'লে ত ভারি ধুম দেখতে পাই! যাচ্চ না কি?"

"যাচ্চি ছেড়ে—হুঁ—হুঁ—গিয়েছিই ধ'রে নাও। বলা বাগ্দীর গাড়ীখানা নগদ আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে বায়না ক'রে রেখেছি। সংক্রান্তির দিন ভোঁরে উঠে রওনা।"—বলিয়া সীতানাথ সকলের পানে চাহিয়া গর্ব্বভরে হাস্য করিলেন।

তারকেশ্বরে সংক্রান্তি-মেলায় এবার এই অভূতপূর্ব্ব আয়োজনের

সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তারকেশ্বর যাইবার পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল নরহরি বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া, নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। নরহরির বয়স ৩২।৩৩ বৎসর—সে এ গ্রামের এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ—অর্থেরও অভাব নাই। রাধাচরণ বলিল, "বিশ্বাস ভায়া, তুমি যে কিছু বল্‌ছ না? তুমি কি যাবে না নাকি?"

নরহরি বিষণ্ণভাবে বলিল, "দেখি!"

দত্ত মহাশয় গ্রাম সম্পর্কে নরহরির ঠাকুরদাদা। তিনি ভ্রু-ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "তুমি দেখবে কি, আমি আগেই দেখে রেখেছি। তোমার যাওয়া হবে না। নাতবৌকে ফেলে কি আর তুমি যেতে পারবে?"

নরহরি বলিল, "সেই ত! বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মনিষ্যি নেই —একলা কার কাছে থাকে বলুন!"

এ কথা শুনিয়া অনেকেই নরহরি পানে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। বসুজ মহাশয় থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঢের ঢের স্ত্রৈণ পুরুষ দেখেছি ভায়া, কিন্তু তোমার মত আর একটি দেখিনি। এতই যদি বিরহের ভয়, তবে না হয় যোড়েই চল। দু'দিকই বজায় থাকবে।"

একজন বলিল, "দোহাই বোসজা! ও পরামর্শটি দেবেন না ওকে। ও যদি সত্যিই পরিবারটিকে গলায় বেঁধে তারকেশ্বর যায়, তাহলে আমাদের কি দশা হবে ভাবুন দেখি একবার! আমাদের

'তিনি'রাও, ধিনি ধিনি ক'রে নেচে উঠবেন; বলবেন, আমরাও যাব। না ভাই নরহরি, ও কার্য্যটি কোর না, কোর না। 'দুঁহু দোঁহা মুখ চেয়ে'—প্রেম-চর্চ্চা তোমরা ঘরে বসেই কর।"

অতঃপর নরহরিকে অব্যাহতি দিয়া, অপর সকলে যাইবার পরামর্শে বসিয়া গেল। তামাক ছিলিমটা শেষ করিয়া নরহরি উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

২

উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা আজিকালিকার কথা নহে—প্রায় ৫০/৫৫ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। তখন সবেমাত্র কাশী অবধি রেল খুলিয়াছে। সবেমাত্র সহরের লোকেরা ইংরাজী পড়িতে সুরু করিয়াছে। দূর পল্লীগ্রামে, অধিকাংশ লোকই তখন নিরক্ষর, কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ লেখা-পড়ার প্রচলন ছিল। তাও, পনেরো আনা তিন পাই লোকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ২।৪ বছরে যতটুকু বিদ্যালাভ সম্ভব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত—অধিক আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ছিল না। এক পাই আন্দাজ লোকই পাঠশালা পার হইয়া সংস্কৃত শিখিতে চেষ্টা করিত। সকলেরই কিছু কিছু জোৎ-জমি ছিল, তাহাতেই তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইত। অবসরকালে কোনও বৈঠকখানায় জমায়েৎ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহারা তাস-পাশা খেলিত বা গুড়ুক ফুঁকিত—এবং নানারূপ খোস-গল্পে সময় কাটাইত। ইংরাজী না পড়ায়, ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনীকে তাহারা

যথোচিত সম্মান করিয়া চলিত এবং কোনও অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রবণ করিলে, এখনকার লোকের মত অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া "হাম্বাগ" বলিয়া উড়াইয়া দিত না—বিশ্বাস করিয়া, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

এই গ্রামখানির নাম মাণিকপুর, তারকেশ্বর এখান হইতে হাঁটা পথে সাত ক্রোশ মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপহসিত নরহরি বিশ্বাসের সংসারে স্ত্রী কুসুমকুমারী ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই। কুসুমের বয়স প্রায় ২৩ হইতে চলিল, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। আর যে হইবে, তাহারই বা আশা কৈ? গ্রামের স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই বলিত, কুসুমকুমারী বন্ধ্যা এবং নরহরির পুনরায় বিবাহ করা উচিত, নহিলে পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের লোপ অনিবার্য্য।

এই দুঃখটুকু ভিন্ন এই দম্পতীর জীবনে আর কোনও দুঃখের ছায়ামাত্রও ছিল না। স্বাস্থ্য উভয়ের অটুট—ম্যালেরিয়ার নামও সেদিনে কেহ কখনও কর্ণগোচর করে নাই। মদন ও রতির তুল্য রূপবান্ ও রূপবতী না হইলেও, উভয়েই আকার অবয়বে সুশ্রী ও প্রিয়দর্শন ছিল। নরহরি ধনশালী ব্যক্তি না হইলেও, তখনকার হিসাবে সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই বিবেচিত হইত। তাহার জোৎ-জমা ছিল, বাগান ছিল, পুকুর ছিল; সে সকলের উপস্বত্বে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। আর একটি অমূল্য সম্পদের তাহারা অধিকারী ছিল—অবিচ্ছিন্ন ও গভীর দাম্পত্য প্রণয়। বস্তুতঃ, তাহাদের দাম্পত্য-প্রণয় গ্রামের মধ্যে প্রবাদ বচনের

মতই প্রচারিত ছিল। স্বামীরা বলিত, "স্ত্রী যদি হতে হয়, তবে ঐ বিশ্বেসদের কুসুমের মতই হওয়া উচিত।" স্ত্রীরা বলিত, "স্বামী যদি হ'তে হয়, তবে ঐ নরহরি ঠাকুরপোর মতই যেন হয়। আজ প্রায় ১৫।১৬ বচ্ছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে—এখনো পর্য্যন্ত দুটিতে যেন জোটের পায়রা।"

কিন্তু এ সকল মন্তব্য তাহারা প্রায় নিজ নিজ দাম্পত্য কলহের সময়েই প্রকাশ করিত। সুস্থমনে পুরুষরা বলিত, বুড়া হইতে চলিল, এ বয়সেও সেই বিশ বছরের ছোঁড়ার মত, 'পলকে প্রলয়' গণিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া বেড়ানো, নরহরির নির্ল্লজ্জ ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নহে। স্ত্রীলোকেরা ব'লিত, "বুড়ী মাগী,—সময়ে একটা মেয়ে জন্মালে আজ নাতির দিদিমা হত, এ বয়সে চৌদ্দ বছুরী ছুঁড়ীর মত 'প্রাণনাথ' বলে স্বামীর গায়ে ঢলে ঢলে পড়া!—গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এ সকল মন্তব্য যে এই দম্পতীর কাণে আসিয়া পৌছিত না, এমন নহে,—শুনিয়া তাহারা হাসিত মাত্র—এবং পরস্পরকে অধিক আদরে-সোহাগে ডুবাইয়া রাখিত।

৩

মহা ধুমধামের সহিত তারকেশ্বরে চড়ক-মেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চড়ক ত মাত্র এক দিন, কিন্তু মেলাটি সপ্তাহকাল থাকিবে। মাণিকপুরের অধিকাংশ পুরুষই—কেহ গো-শকটে, কেহ পদব্রজে—তারকেশ্বরে আসিয়াছে এবং বলা বাহুল্য, পথি নারী বিব-

র্জ্জিতা নীতির অনুসরণ করিয়া কেহই নিজ স্ত্রী কন্যা ভগিনীকে সঙ্গে লয় নাই। ২।৩ দিন পরে গ্রামবাসী কেহ কেহ মেলা দেখিয়া ফিরিয়া আসিল এবং উৎসবের বর্ণনায়, যাহারা যায় নাই বা যাইতে পায় নাই, তাহাদিগকে ব্যস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

৩রা বৈশাখ অপরাহ্ণকালে পাড়ার ৩।৪ জন বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোক কুসুমকুমারীর কাছে আসিয়া ধরিয়া বসিল—"এত ধুমধাম, আমরা কিছুই কি তার দেখতে পাব না? সংসারে কি কেবল খেটে মরতেই এসেছি? তোমার স্বামীকে বল, আমাদের সকলকে তারকেশ্বরে নিয়ে চলুন।"

খুড়ীমা, জ্যেঠাইমা—যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ অনুসারে সম্বোধন করিয়া কুসুম বলিল, "কিন্তু শুনলাম, সেখানে যে রকম ভীড় হয়েছে, বাসা পাওয়াই যে শক্ত হবে। পুরুষমানুষেরা গাছতলাতেও পড়ে থাকতে পারে! কিন্তু আমরা মেয়েছেলে ত তা পারবো না!"

এক বৃদ্ধা কহিলেন, "সে জন্যে কোনও ভাবনা নেই। আমার ভাইঝির বিয়ে হয়েছে, তারকেশ্বরের খুব কাছেই। এমন কি, সে গ্রামের বাইরে বেরুলেই বাবার মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাওয়া যায়। সেইখানে গিয়ে আমরা থাকবো এখন। আমি যখন বাবাকে দর্শন করতে যাই, সেইখানেই গিয়েই ত থাকি। জামাইটি বড় ভাল, অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল, আমাদের গুরুর আদরে রাখবে, তুমি দেখো।"

অবশেষে কুসুম স্বীকৃত হইল। বলিল, "আচ্ছা, ওঁর কাছে কথাটা পেড়ে দেখি, উনি কি বলেন।"

পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা হাসিয়া বলিলেন, "ওলো নাতবৌ, তুই যদি বায়না নিস্ ত নাতির সাধ্যি নেই যে, সে কথা ঠেলে।"

বাস্তবিক, বৃদ্ধার ভবিষ্যদ্‌বাণীই সফল হইল। নরহরি সম্মত হইল। পরদিন প্রাতে একখানি গো-শকটে সস্ত্রীক নরহরি এবং অপর একখানিতে ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমা তারকেশ্বর যাত্রা করিলেন।

৪

মাণিকপুর গ্রাম হইতে আগত বেণী বসু, সীতানাথ দত্ত প্রভৃতি একত্র বাসা করিয়াছেন। যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়া খুব আনন্দেই তাঁহারা সময় কাটাইতেছিলেন। বিশেষতঃ বেণী বসু থিয়েটার দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এই দলটি কলিকাতার কোনও একটি "অবৈতনিক" সম্প্রদায়। পুরুষমানুষই গোঁফ-দাড়ি কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজে। এক দিন শকুন্তলা, এক দিন নব-নাটক এবং একদিন নীলদর্পণ অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকবৃন্দ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই আর এক দিন নীলদর্পণ অভিনীত হইবে। থিয়েটারের দল যেখানে বাসা করিয়াছে, বেণী বসু তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই দলের কয়েক জন লোকের সহিত বেশ আলাপও জমাইয়া তুলিয়াছেন। সীতানাথ ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিয়াছেন, গ্রামে ফিরিয়া তথায় একটি থিয়েটারের দল খুলিতে হইবে। এই অবৈতনিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অভিনেতা শিবনাথ

সান্ন্যাল এ বিষয়ে ইঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শিবুর বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর, কথাবার্ত্তায় খুব চৌকস; কিন্তু একটু ইংরাজী বুক্‌নি মিশানো তার অভ্যাস। অভিনয় কার্য্যে সে ওস্তাদ।

পাকাপাকি পরামর্শ করিবার জন্য বেণী বসু আজ শিবনাথকে নিজেদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া তিনি থিয়েটারী বাসায় গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পর শিবনাথকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসায় আসিতেছিলেন। পথে নরহরির সহিত সাক্ষাৎ। বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, তুমিও যে এসেছ দেখছি!"

নরহরি বলিল, "না এসে আর কি করি বল বেণীদা! গিন্নী যে ছাড়লেন না!"

"গিন্নীকেও এনেছ না কি?"

"এনেছি বৈকি। তা ছাড়া মিত্তির বাড়ীর ঠান্‌দিদি, মুখুয্যে-দের খুড়ীমা, জ্যেঠাইমাও এসেছেন। তাঁরা সব আরতি দেখতে গেছেন, আমি তাঁদের আনতে যাচ্ছি।"

"আচ্ছা, তা বেশ বেশ। এলেই যদি, দু'দিন আগে আস্‌তে হয়; নীলদর্পণ দেখতে পেতে। আচ্ছা তাতে ক্ষতি নেই, কা'ল রাত্রে আবার নীলদর্পণ হবে। দেখতে যেও নিশ্চয়! সে যে কি চমৎকার—দেখলে আর জীবনে ভুলতে পারবে না। চল হে শিবু রাত হয়ে যাচ্ছে।"

পথে শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে ফেলো?"

বেণী বসু নরহরির পরিচয় দিলেন; তাহার অসাধারণ পত্নী-ভক্তির বিষয়ও সালঙ্কারে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শিবু হাসিতে লাগিল।

বাসায় পৌঁছিয়া বেণী বসু দেখিলেন, সীতানাথ হুঁকা হাতে বসিয়া পাকা রুই মাছের পোলাও রন্ধন তদারক করিতেছেন। বলিলেন, "শিবুকে ধরে নিয়ে এলাম ঠাকুর্দ্দা! আর একটা খবর শুনেছেন? নরহরি এসেছে। এইমাত্র পথে আসতে আসতে তার সঙ্গে দেখা হ'ল।"

সীতানাথ বলিলেন, "কে? আমাদের গ্রামের নরহরি? সত্যি না কি? বউকে ফেলে? দেখি দেখি, সূয্যি আজ কোন দিকে অস্ত যাচ্চেন।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সীতানাথ বারান্দা হইতে গলা বাড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন।

বেণী বসু বলিলেন, "বউকে ফেলে আসবে, তাও কি সম্ভব, ঠাকুর্দ্দা? সঙ্গেই এনেছে।"

সীতানাথ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "বউটাকে এই ভিড়ে, গলায় বেঁধে নিয়ে এসেছে নাকি? কেলেঙ্কারী!"

বেণী বসু ইতিমধ্যে মাদুর বিছাইয়া, শিবনাথকে লইয়া তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন। সীতানাথ দুই জনকে দুই ভাঁড় সিদ্ধি দিয়া নিজে এক পাত্র লইয়া পান করিতে করিতে বলিলেন, "কেলেঙ্কারী আর কাকে বলে? এক পাড়ায় বাস, আমাদের গিন্নীরাও ত সবই শুনেছেন, দেখেছেন; বাড়ী ফিরে গেলে আমাদের দশাটা কি হবে বল দেখি দাদা!"

বেণী বসু কহিলেন, "জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারলে! ইচ্ছে করে, আচ্ছা ক'রে নোরেটাকে জব্দ ক'রে দিই।"

"তা, দাওনা—একটু শিক্ষা হোক। কিন্তু কি উপায়ে জব্দ করবে, সেইটে বল দেখি?"

বেণী বসু সিদ্ধির খালি ভাঁড়টি নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "কত রকম উপায় হ'তে পারে। এই ধরুন, গ্রামে কারু নামে এখান থেকে যদি একটা উড়ো চিঠি লেখা যায় যে নরহরির স্ত্রীকে সুন্দরী দেখে, মোহান্ত মহারাজ—'

ঠাকুর্দ্দা বাধা দিয়া কহিলেন, "না না—সতীলক্ষ্মী—তা কি কর্‌তে আছে? ছিছি তা কোরো না! হাজার হোক্ গৃহস্থের বউ! এমন কোনও উপায় বের কর, যাতে দু'জনের খুব চুলোচুলি বেধে যায়। দিন কতক একটু মজা দেখে নিয়ে, তার পর সব ভেঙ্গে দিলেই হবে এখন, কি বল শিবু ভায়া?"

শিবু বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই ভাল। ওঁর ওয়াইফ্ কি খুব সুন্দরী নাকি?"

বেণী বসু বলিলেন, "এমন কিছু ডানাকাটা পরী যে তা নয়, তবে রংটা ফর্সা আছে, মুখ-চোখও ভাল।"

"নাম কি?"

"কুসুমকুমারী।"

"এজুকেটেড? চিঠি লিখতে পারে?"

বেণী বসু বলিলেন, "তোমার যেমন কথা! এ কি কল্‌কাতার

মেয়ে যে লেখাপড়া জানবে? কেন, জানলে কি করতে? তার নামে কোনও জাল প্রেমপত্র টত্র—"

শিবু বলিল, "না, এম্‌নিই জিজ্ঞাসা করলাম।"

এই সময় আর দুইজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিয়া জুটিলেন। এ প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সীতানাথ উঠিয়া পাকের স্থানে গিয়া, পোলাও রন্ধনের তদ্বিরে ব্যাপৃত হইলেন।

৫

পরদিন সন্ধ্যায় আবার নীলদর্পণের অভিনয় হইল। স্ত্রী ও ঠান্‌দিদি প্রভৃতিকে লইয়া নরহরি থিয়েটার দেখিয়া আসিল।

তাহার পরদিন থিয়েটারের দল কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। যাত্রার দল, বাই, খেমটা প্রভৃতি এখনও আসর গরম রাখিয়াছে, এমন সময় মেলায় আর একটা নূতন "আকর্ষণ" উপস্থিত হইল। একজন নাকি অসাধারণ সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি লোকের হাত দেখিয়া, ভূত-ভবিষ্যৎ ত তুচ্ছ কথা, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন। তবে, তাঁহার দক্ষিণাটা কিছু বেশী—নগদ ষোল আনা। তিনি না কি কেদার বদরীর পথে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ হইতে এখনও ৫।৬ হাজার টাকা লাগিবে, তাই বাবাজী এই উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন মাত্র—নচেৎ তাঁহার আহার দৈনিক আড়াই সের দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফলমূল মাত্র।

বেণী বসু এক দিন গিয়া হাত দেখাইতে আসিলেন। পরিচিত

অপরিচিত যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, বলিতে লাগিলেন, "বাবাজীর ক্ষমতা একেবারে অদ্ভুত! অত্যাশ্চর্য্য! আমার জীবনের পূর্ব্বকথা যা যা বল্লেন, শুনে ত মশাই আমি 'থ' হয়ে গেছি।" আবার কেহ কেহ এমনও বলিতেছে, "বেটা বুজরুক্! আন্দাজি ঢিল মারে, এক একটা লেগেও যায়। টাকা উপায়ের একটা ফন্দি করেছে।" —কিন্তু তথাপি হাত গণাইবার লোকের অভাব হইতেছে না। বাবাজী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, বেলা ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক এবং অপরাহ্ন ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পুরুষগণের হাত দেখিবেন। একটি কাগজে নাম-ধাম ও জন্ম-নক্ষত্র লিখিয়া, সেই কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া, চেলার দ্বারা ভিতরে বাবাজীকে পাঠাইয়া দিতে হয়; যথাসময়ে ডাক পড়ে।

সে দিন সন্ধ্যার পর রন্ধন করিতে করিতে খুড়ীমা নরহরির স্ত্রী কুসুমকে বলিলেন, "আচ্ছা বউমা, তুমি একবার গিয়ে হাত দেখাও না কেন! তোমার ছেলেপিলে হ'ল না কেন, কি ব্রত-ট্রত মানত টানত করলে হতে পারে, সেটা জেনে এলে হয়।"

জ্যেঠাইমা ও ঠান্‌দিও এ প্রস্তাবে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। কুসুম গিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল; নরহরি আপত্তি করিল না।

পরদিন প্রাতে কুসুমকে লইয়া ইঁহারা বাবাজীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নিয়ম অনুসারে নাম ও জন্মনক্ষত্র লেখা কাগজে একটি টাকা মুড়িয়া চেলা বাবাজীর দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একে একে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের ডাক হইতে লাগিল। ক্রমে শেষে যিনি

গিয়াছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, চেলা ডাকিল, "কুসুম-কুমারী দাসী কার নাম ? শীগ্‌গির এস।"

কুসুম উঠিল। ভিতরে যাইতে তাহার পা কাঁপিল। প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ জটাজুটধারী, ভস্মাচ্ছাদিতদেহ বাবাজীকে দেখিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন, "জিতা রও বেটী ! তুমি কি জানতে চাও বল।"

কুসুম সভয় কণ্ঠে বলিল, "আজ ১৫ বচ্ছর হ'ল আমার বিয়ে হয়েছে —আজ পর্য্যন্ত একটি সন্তানের মুখ দেখতে পেলাম না, তাই আমরা স্ত্রী-পুরুষ বড়ই মনের দুঃখে আছি বাবা ! কি পাপে এ রকম হ'ল, কি করলে সে পাপ খণ্ডাতে পারে, সেইটি যদি বাবা দয়া করে আমায় বলে দেন !"

বাবাজী বলিলেন "হুঁঃ ! তোমার একটি সন্তান দরকার ? তার জন্যে চিন্তা কি ? কি সন্তান চাও ? পুত্তুর সন্তান, না কন্যে সন্তান ?"

কুসুম সলজ্জভাবে মাথাটি হেঁট করিয়া বলিল, "একটি পুত্তুর সন্তান হইলে আমার শ্বশুর-বংশের জলপিণ্ডি বজায় থাকৃত, বাবা !"

বাবাজী বলিলেন, "হুঁ—পুত্তুর সন্তান চাই ? এ আর বিচিত্র কথা কি ? এস, সরে এস, বাঁ-হাত খানি তোমার দেখি !"

কুসুম সভয়ে অগ্রসর হইয়া, নিজ বাম হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। বাবাজী হাতখানি ধরিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত তাহা নিরীক্ষণ

করিয়া, হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "না, তোমার পুত্তুর সন্তান হবে না,—কোন সন্তানই হবে না।"

কুসুম কাতরভাবে বলিল, "কেন বাবা? কি পাপের জন্যে—"

বাবাজী বাধা দিয়া বলিলেন; "বিশেষ কোনও পাপের জন্যে নয় মা—কোনও একটা গূঢ় কারণের জন্যেই তোমার সন্তানভাগ্য নষ্ট হয়ে গেছে।"

কুসুম হাতযোড় করিয়া বলিল, "কেন বাবা কি গূঢ় কারণ?"

বাবাজী বলিলেন, "সে গূঢ় কারণটি পূর্ব্বজন্মঘটিত। শুনতে চাও?"

কুসুমের কৌতূহল অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ বাবা, দয়া ক'রে বলুন—জানবার জন্যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।"

বাবাজী বলিলেন, "কিন্তু সে যে অতি গুহ্য কথা, মা! অন্য কিছু ত নয়—পূর্ব্বজন্মের কথা,—নরলোকে তা প্রকাশ করাই নিষেধ। তবে আমি তোমায় বলতে পারি, যদি তুমি আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পার যে, সে কথা এ জীবনে কাউকে, এমন কি, তোমার স্বামীকেও বলবে না। যদি এ নিষেধ অমান্য কর, তবে একমাস মধ্যেই তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে। বেশ করে ভেবেচিন্তে দেখ।"

কুসুম কোনও ভাবনা-চিন্তা না করিয়াই বলিল, "না বাবা আমি কারুথ্‌কে বলবো না। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌ছি—" বলিয়া সভয় কম্পিতহস্তে বাবাজীর পদস্পর্শ করিল।

বাবাজী তখন মুখখানি বিষম গম্ভীর করিয়া, অনুচ্চ স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"পূর্ব্বজন্মেও তুমি কায়স্থ কুলেই জন্মেছিলে—তুমি একজন লক্ষ্মীমন্ত লোকের স্ত্রী ছিলে। মুর্‌সুদাবাদ সহরে, তোমার স্বামীর মস্ত একটা নুনের গোলা ছিল, প্রায় লাখো টাকার কারবার। নৌকো নৌকো বোঝাই নুন আস্‌তো,—২০।২৫ জন দুলে, বাগ্দী—এই রকম সব ছোট জাত—তোমাদের মাইনে করা চাকর ছিল, তারা সব, নুনের বস্তা নৌকা থেকে নামিয়ে, পিঠে ক'রে বয়ে বয়ে, গোলায় নিয়ে গিয়ে তুল্‌তো। আবার নুন কোথাও চালান দিতে হ'লে, গোলা থেকে বের ক'রে পিঠে ক'রে নিয়ে গিয়ে নৌকোতে বোঝাই দিত। এই ছিল তাদের কায। এ জন্মে যে লোক তোমার স্বামী হয়েছে, সেও ছিল তোমাদের একজন মাইনে করা মুটিয়া, —জেতে বাগ্দী ছিল।

কুসুম বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! বাগ্দী!" ঘৃণায় তাহার দেহ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

"হ্যাঁ—বাগ্দী ছিল। নামটি যদি জানতে চাও, তাও ব'লে দিতে পারি। কেষ্টা বাগ্দী। গতজন্মে তুমি বড়ই রাগী ছিলে মা, কিন্তু বড়ই বুদ্ধিমতী ছিলে। স্বামীর মৃত্যুর পর কারবারটি তুমি নিজেই চালাতে লাগলে। ঐ কেষ্টা বাগ্দী ছিল বিষম চোর। তোমার নুনের গোলা থেকে গঙ্গার ঘাট প্রায় পোয়াটেক পথ। কেষ্টা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই পথে দুই এক বস্তা নুন আধা-কড়িতে কাউকে বেচে ফেলতো। একদিন ধরা পড়ে যায়।

তোমার কাছে খবর হ'ল। সেই শুনে তুমি রেগে কাঁই! সরকারকে হুকুম দিলে, 'হারামজাদা বেটাকে দশ জুতো মেরে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও।'—কেষ্টা অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, সরকারের পায়ে ধ'রে কেঁদে বল্লে দোহাই সরকার মোশাই, এবার আমায় মাফ করতে আজ্ঞে হয়—আর কক্ষনো এমন কায করবো না।'—সরকার বল্‌লে, 'কর্ত্রীঠাকুরুণ নিজে হুকুম দিয়েছেন, আমি মাফ করবার কেরে বেটা?'—হুকুম তামিল হ'ল। কেষ্টার পিঠে দশ ঘা জুতো মেরে তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কেষ্টা দুঃখে, অভিমানে সেই দিন গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবে স্থির করলে। গঙ্গার ধারে গিয়ে, 'হে মা গঙ্গে, হে মা পতিতপাবনি! এই অধম সন্তানকে তোমার কোলে ঠাঁই দাও মা!—তোমার অভাগা সন্তানের এইমাত্র ভিক্ষা, মা, আর জন্মে আমি ঐ হারামজাদী কর্ত্রীঠাকুরুণকে যেন উঠতে-বসতে জুতোপেটা করতে পারি।' এই বলতে বলতে কেষ্টা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল।"

কুসুম বলিল, "সে আমায় জুতো মারতেই চেয়েছিল। তবে আমার স্বামী হয়ে জন্মালো কেন?"

বাবাজী বলিলেন, "এইটে আর বুঝতে পারলে না, মা? নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া অন্য স্ত্রীলোককে কি জুতো মারা চলে? শাস্ত্রের নিষেধ যে!"

কথাগুলি শুনিয়া কুসুমের তখনই বিশ্বাস হইল না। সে বলিল "কিন্তু বাবা, কৈ, সে ত আমার সঙ্গে কোন দিন কোন দুর্ব্ব্যবহার করেনি! বরঞ্চ—"

গণৎকার বলিল, "দাঁড়াও মা, এখনই কি তাই সে করবে?—এখনও যে তুমি, কি বলে হুঁ হুঁ—ছেলেমানুষ কি না! আর বছর কতক যাক্, তোমার চুল ২।১ গাছি পাকুক, তখন দেখো, তোমার সঙ্গে ও কি রকম ব্যবহার করে। অত কথায় কায কি, তোমায় একটা পরীক্ষা আমি বলে দিচ্ছি, তা হ'লেই তুমি বুঝতে পারবে আর জন্মে ও বাগ্দী ছিল কি না।"

কুসুম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি পরীক্ষা বাবা?"

বাবা বলিলেন, "ও যখন ঘুমুবে, তুমি ওর পিঠ চেটে দেখো।—আর জন্মে পিঠে নুন ব'য়ে ব'য়ে পিঠ এমন নোন্‌তা হয়ে গেছে যে, এখন ২।৩ জন্ম লাগ্‌বে ওর সেই নুন কাট্‌তে!—আচ্ছা, এখন ঘরে যাও মা, অনেক লোক এখনও অপেক্ষা করছে।"

কুসুম তখন গণৎকার ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, ম্লানমুখে সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাসায় পৌঁছিলে, সুযোগমত নরহরি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাত দেখে বাবাজী কি বল্লেন?"

কুসুম সংক্ষেপে উত্তর করিল, "ছেলে হবে না বল্লেন!"—বলিয়া ম্লানমুখে চলিয়া গেল।

৬

নরহরি সেই দিনই আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া, অপরাহ্ণকালে আবার তারকেশ্বর দর্শনে চলিল। তথায় গ্রামস্থ বন্ধুগণের আড্ডায় পৌঁছিয়া দেখিল, সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে!

মেলাস্থানে গিয়া দুই এক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আর সকলে কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "তারা হাত গোণাতে গেছে।" গণৎকার ঠাকুরের অসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অনেক প্রশংসাবাদ করিল। বলিল, "আমরাও যাচ্ছি—যাবে তুমি?"

নরহরি ভাবিল, কুসুম ত হাত দেখাইয়া গিয়াছে, গণৎকার ঠাকুর তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন, সন্তান হইবার কোনও আশা নাই। যাই না, আমিও হাত দেখাই, আমাকেই বা কি বলেন শুনা যাক্। আমিই যে কুসুমের স্বামী তাহা ত আর ঠাকুর জানেন না! তাঁহার যথার্থ গণনাশক্তি আছে অথবা বুজরুকি মাত্র, তাহা পরীক্ষা করিবার এই সুযোগ। বলিল, "বেশ চল আমিও হাত দেখাব।"

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া নাম-ধাম ও জন্ম নক্ষত্র লিখিত কাগজে একটি টাকা জড়াইয়া চেলার দ্বারা ভিতরে পাঠাইয়া নরহরি অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার ডাক হইল।

নরহরি ভিতরে গিয়া প্রণাম করিতেই বাবাজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি তোমার মনস্কামনা, বল বাবা!"

নরহরি বলিল, "মনস্কামনা এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার হাতটা একবার দেখুন; আমার আয়ুস্থান, ধনস্থান, পুত্রস্থান—এইগুলো সব কেমন, সেইটে জান্‌বার অভিলাষ।"

"আচ্ছা, স'রে এস—দাও, হাত দাও, দেখি।"

নরহরি, বাবাজীর নিকট বসিয়া নিজ দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিয়া, বাবাজীর পরিচ্ছদটি দেখিতে লাগিল। এত টাকা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু—ওঃ—কি বৈরাগ্য! আলখাল্লাটি ছেঁড়া এবং তালি দেওয়া, তাও রং মিলে নাই। অথচ ইচ্ছা করিলে ইঁনি রোজ একটা নূতন রেশমী আলখাল্লা কিনিয়া পরিতে পারেন।

বাবাজী কিয়ৎক্ষণ নরহরির হস্ত নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "তোমার আয়ুস্থান ত তেমন সুবিধে নয়, বাবা! ৫২ বছর মাত্র তোমার পরমায়ু, ঐ সময় তোমার অপঘাতমৃত্যু! বিষপ্রয়োগে তোমার মৃত্যু—তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।"

শুনিয়া নরহরি শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল, "বলেন কি ঠাকুর!"

ঠাকুর বলিলেন, "আমি কি বলছি? বলছে তোমার অদৃষ্টলিপি। ধনস্থান—বড় মন্দও নয়; ৪০ বৎসর বয়স হলে হঠাৎ এমন একটা উপায়ে তোমায় বিপুল ধনাগম হবে, যা তুমি কখনও স্বপ্নেও ভাবনি: তার পর যশস্থান, সেটাও ঐ ৪০ বছর বয়সের পরে। যশ জিনিষটে ধনেরই অনুগামী কি না! তার পর পুত্রস্থান—কৈ, না, এখানে ত কিছুই নেই, একেবারে শূন্য যে! তোমার কি কোনও ছেলে পিলে হয়েছে?"

নরহরি হতাশভাবে বলিল, "না।"

বাবাজী বিষণ্ণভাবে মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন, "একদম শূন্য!"

"কেন বাবা, পুত্রস্থান আমার শূন্য হ'ল কেন? এটা খণ্ডাবার কি কোন উপায় নেই? কোনও রকম ব্রতট্রত কি যাগ-যজ্ঞ করলে দোষটি খণ্ডাতে পারে না?"

বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কয় স্ত্রী?"

"একটী মাত্র।"

বাবাজী ঠোঁট গুটাইয়া বলিলেন, "হুঁ! সে আমি তোমার হাত দেখেই বুঝতে পেরেছি। এ স্ত্রীর গর্ভে তোমার সন্তান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে যদি অন্য বিবাহ কর, তা হ'লে সন্তান আপনিই হবে, তার জন্যে যাগ যজ্ঞ কিছুই করতে হবে না। কিন্তু এ স্ত্রী হ'তে হবে না। শুধু তাই নয়, বাবা, এ স্ত্রীকে তুমি বেশী 'নাই' দিও না।"

"কেন বাবা? 'নাই' দিলেই বা কি অশুভ হবে, না দিলেই বা তার শুভফল কি?"

বাবাজী বলিলেন, "নাই দিলে মাথায় উঠবে। আসল কথা শুনতে চাও? সে কিন্তু গত জন্মের কথা।"

"বেশ ত, বলুন না।"

"বেশ ত বলুন না' বল্লেই হলো না, বাবা! পূর্ব্ব জন্মের কথা—এ সকল গুহ্যাতিগুহ্য বিষয়। যাকে তাকে অমনি বল্লেই হ'ল? তুমি যদি আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পার যে, আজ আমি তোমায় যা শোনাব, তুমি নরলোকে কারু কাছে তা প্রকাশ করবে না, তবেই তোমায় বলতে পারি! কথাটি যদি তুমি প্রকাশ ক'রে ফেল, তবে তোমার ঘোর অমঙ্গল হবে।"

নরহরি কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তাহার পর বাবাজীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিল।

বাবাজী তখন বলিতে লাগিলেন, "আর জন্মে তুমি মুক্সুদাবাদে নবাব সরকারে চাকরী করতে। অবস্থা তোমার বেশ ভালই ছিল। বুড়ো বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হ'লে তুমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলে। এ স্ত্রী ভারী সুন্দরী ছিল। যেমন হয়ে থাকে, তুমি তার অত্যন্ত বশীভূত হয়ে পড়েছিলে; যাকে ঘোর স্ত্রৈণ বলে, তাই আর কি! তোমার একটি কুকুর ছিল—ঠিক কুকুর নয়—কুক্কুরী—তোমার আগেকার স্ত্রী সেই কুকুরটিকে বড়ই ভালবাসতেন। তোমার এই দ্বিতীয় পক্ষটি, সেই জন্যে, কুকুরটিকে মোটেই দেখতে পারতো না। তাকে মারতো, ভাল করে খেতে দিত না। এক দিন সে কুকুরটিকে এক লাথি মেরেছিল, কুকুরটি রাগ না সামলাতে পেরে ঘ্যাঁক্ করে তার পায়ে কামড়ে দেয়। এই আর যায় কোথা! বেটি ত কেঁদেই অনর্থ। তুমি বাড়ী এসে, তাই দেখে, রাগের বশে কুকুরের মাথায় এক লাঠি মেরেছিল, তাতেই তার মৃত্যু হয়। মরবার সময় সে মনে মনে বলেছিল, কার দোষ, বাবু তার কিছুই অনুসন্ধান করলেন না, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথা শুনে আমার প্রাণবধ করলেন!—এই ভাবতে ভাবতে সে প্রাণত্যাগ করলে। তার পরেই তার আত্মা, কাশীতে বাবা বটুকভৈরবের দরবারে উপস্থিত। বটুকভৈরবই হলেন কুকুরদের দেবতা কি না। কুকুরটি হাতযোড় ক'রে বাবাকে বল্লে 'হে বাবা বটুকভৈরব, এই বর আমাকে দাও, আর জন্মে যেন ওকে এর প্রতিফল দিতে পারি।

আমায় যেমন ও বধ করেছে আর জন্মে আমিও যেন ওকে মেরে ফেলতে পারি।' বাবা বল্লেন, 'পাগলা কুকুর না হ'লে ত তার কামড়ে মানুষ মরে না। তা ছাড়া তোর পাপ শেষ হয়েছে, তুই এবার মানুষ হয়ে জন্মাবি। তার চেয়ে বরঞ্চ তুই ওর স্ত্রী হয়ে জন্মাস্, বিষ খাইয়ে ওকে মেরে ফেলিস্।' সেই জন্তেই সেই কুকুর—বা কুক্কুরী—তোমার স্ত্রী হয়ে জন্মেছে—তোমায় বিষ খাইয়ে মারবে তবে ছাড়বে!"

নরহরি বলিল, "কি বলেন আপনি! আমার স্ত্রী আর জন্মে কুকুর ছিল? আমিই তাকে মেরে ফেলেছিলাম? এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করি?"

বাবাজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। প্রকৃত ঘটনা যা, তাই আমি তোমায় বল্লাম। তুমি পীড়াপীড়ি করলে ব'লেই বল্লাম, নৈলে কারু পূর্ব্বজন্মের কথা সহসা আমি প্রকাশ করিনা।"

নরহরি সবিনয়ে বলিল, "বাবা, আপনাকে আমি অবিশ্বাস করিনি। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, তাই আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ ও কথাটা বেরিয়ে পড়েছিল; আপনি কিছু মনে করবেন না, বাবা! কেবল একটা বিষয়ে খট্‌কা ঠেকেছে। আমাকে বিষ প্রয়োগেই যদি ও মারবে তা হ'লে স্ত্রী হয়ে জন্মাবার কি দরকার ছিল? অন্য যে কেউ ত—"

বাবাজী বলিলেন, "এ ত সে কুকুর বলেনি, বলেছেন বাবা বটুকভৈরব, দেবতার লীলা কি সহজে বোধগম্য হয়? বোধ হয়,

এর মীমাংসা এই—ও সব কাযে স্ত্রীর যেমন সুযোগ হবে, তেমন আর কার ?"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁ, তা বটে !"

বাবাজী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে প্রমাণ যদি পাও তা হ'লে বিশ্বাস হবে ত ?"

নরহরি বলিল, "আপনার দয়া ।"

বাবাজী তাহাকে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর নামটি এতে লেখ ।"

বাবাজী লিখিত কাগজখানি ফেরত লইয়া কুসুমকুমারী নামের ২য়, ৩য়, ও ৫ম অক্ষর কাটিয়া, সেই নরহরির হাতে দিয়া বলিলেন, "পড় ।"

নরহরি পড়িল—"কুকুরী ।" তাহার গা শিহরিয়া উঠিল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন, "আরও প্রমাণ আছে। রোজ রাত্রে তুমি ঘুমুলে, কুকুরের যা স্বধর্ম্ম—তোমার স্ত্রী তোমার পিঠ চাটে। কোনও দিন জানতে পারনি কি ?"

"আজ্ঞে না। আমার ঘুমটা খুব গভীর হয় ।"

"আচ্ছা, একদিন ঘুমের ভাণ ক'রে পিছু ফিরে শুয়ে থেক। তা হলেই দেখতে পাবে ।"

নরহরি বিদায় গ্রহণ করিল। মেলার কোনও তামাসা দেখা আর তাহার ভাল লাগিল না। তারকেশ্বরে থাকিতেই আর ভাল লাগিল না।

পরদিন ঠান্‌দি, খুড়ীমা ও জ্যেঠাইমার বিস্তর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সকলকে লইয়া নরহরি বাড়ী ফিরিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর সীতানাথ দত্তের তারকেশ্বরের বাসায় শিবনাথ তাস খেলিতে আসিল। সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল হে, শিবু?"

শিবনাথ হাসিয়া বলিল, "পরামর্শ যেমন যেমন হয়েছিল, ঠিক সেই রকমই বলেছি। কিন্তু দাদা, যাই বল, ছুঁড়ীটেকে যখন বল্লাম তোমার হাজ্‌বাণ্ড অরে জন্মে বাগ্‌দী ছিল, তখন তার মুখখানি এমন সরোফুল হয়ে গেল যে দেখে আমার ভারী দুঃখ হতে লাগলো। ভাবলাম, দূর হোক্‌ গে, কথাটা পাল্টে নিই;—অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছিলাম।"

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর মিন্‌ষেটা?"

"মিন্‌ষেটার প্রাণে বড় ফিয়ার হয়েছে। স্ত্রী বিষ খাওয়াবে সোজা কথা?"

বেণী বসু বলিলেন, "কিন্তু বুদ্ধিটে খুব বের করেছিলে ভায়া হাঃ হাঃ—একজন ছিল কুকুরী, এক জন হুন বওয়া মুটে! বাস্তবিক তোমার বুদ্ধির তারিফ্‌ করতে হয়।"

শিবু বলিল, "আমরা হলাম ক্যালকাটাজ্‌ সন্‌—আমাদের হাড়ে ভেল্কী খেলে!"

সকলে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সীতানাথ বলিলেন, "সাজগোজটিও তোমার চমৎকার হচ্ছে! আচ্ছা ঐ দিনে কত টাকা রোজগার হ'ল?"

শিবু বলিল, "ও দিকে ডেলি ২৫।৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত হচ্ছিল। এখন ক্রমেই কিন্তু কমছে। মেলা ত প্রায় ফিনিশ হয়ে এল কি না। লোক আর তেমন কৈ?"

তাহার পর তাসখেলা আরম্ভ হইল।

৬

সেদিন নরহরির বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই—কুসুম তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া আসিয়া আলুভাতে ভাত চড়াইয়া দিল।

আহারের সময় নরহরির মনে হইতে লাগিল, সে যেন কুকুরের ছোঁয়া ভাত খাইতেছে। খাইয়া তৃপ্তি হইল না; পূরা খাইতেও পারিল না; অর্দ্ধেক পাতে ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

আচমন করিয়া পাণ মুখে দিয়া নরহরি বিছানায় শয়ন করিল। কুসুম আসিয়া তামাক সাজিয়া দিল। বিছানায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নরহরি বলিল, "যাও আর দেরি কোর না—খেয়ে এসে শুয়ে পড়, সারাদিন গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে শরীর একেবারে এলিয়ে গেছে—আমি ত ঘুমে চোখে দেখতে পাচ্ছিনে।"

কুসুম রান্নাঘরে চলিয়া গেল। স্বামীর থালার নিকট দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল "কি করবো? পাতে আর খাব কি? কায়েতের মেয়ে হয়ে শেষে বাগ্দীর এঁটোটা খাব?"—আবার ভাবিল, "আর

জন্মেই বাগ্দী ছিল, এ জন্মে ত কায়েত। আর হাজার হোক্ স্বামী ত বটে! খাই না হয়!"

হেঁসেল হইতে আর কিঞ্চিৎ ভাত-তরকারী আনিয়া পাতে ঢালিয়া লইয়া কুসুম খাইতে বসিল। কিন্তু বাগ্দীর উচ্ছিষ্ট খাইতেছি মনে করিয়া তাহার গা-টা কেমন "ঘিন্ ঘিন্" করিতে লাগিল।

কোন মতে আহার শেষ করিয়া কুসুম উঠিল। কায কর্ম্ম সারিয়া শয়নঘরে গিয়া দেখিল স্বামী বিছানায় অপর প্রান্তে পাশ-বালিশ আঁকড়াইয়া পিছু ফিরিয়া নিদ্রিত। তাঁহার নিশ্বাস বেশ গভীরভাবে পড়িতেছে।

কুসুম পাণ খাওয়া শেষ করিয়া, বাহিরে গিয়া কুলকুচা করিয়া, মুখ ও জিহ্বা পরিষ্কার করিয়া লইল। তাহার পর দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ নিবাইয়া, ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া শয়ন করিল। স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো, ঘুমুলে?"

কোনও উত্তর নাই। কুসুম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমুলে না কি?"

উত্তর নাই। কুসুম তখন স্বামীকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন বুঝিয়া, জিহ্বা দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতে লাগিল। হাঁ, নোন্‌তা ত বটেই! পিঠে নুনের বস্তা না বহিলে কি কারও পিঠ এত লবণাক্ত হইতে পারে? বাবাজীর কথায় কুসুমের মনে একটু যাহা সন্দেহ ছিল, এতক্ষণে তাহা দূরীভূত হইল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, বসিয়া

বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এবং তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তাহার পর খাট হইতে নামিল। প্রদীপ জ্বালিয়া, দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। নরহরি মাথা তুলিয়া একবার দ্বারের দিকে চাহিল, স্ত্রীর শাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগমাত্র দেখিতে পাইল। ভাবিল, "এত রাত্রে আবার চল্লেন কোথায়? হাড়-টাড় চিবুতে না কি?"—বারান্দায় জলের শব্দ শুনিল, কুসুম কুলকুচা করিতেছে। নরহরি আবার উপাধানে মস্তক দিয়া নিদ্রার ভাণ করিল।

কুসুম ঘরে আসিয়া পাণ খাইয়া শয্যার প্রান্তদেশে সঙ্কুচিতভাবে শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণমধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নরহরি তখন উঠিয়া বাহিরে গিয়া জল-হাতে পিঠের চাটা অংশটুকু বেশ করিয়া ধুইয়া আসিয়া শয়ন করিল।

৭

স্বামী স্ত্রীর সে অখণ্ড স্নেহপ্রেম কোথায় উড়িয়া গেল। ইহাদের মধ্যে কোনও দিন যাহা হয় নাই তাহাও হইতে লাগিল মাঝে মাঝে কলহ-কিচিকিচিও হইতে লাগিল। ক্রমে কুসুম শুনিল তাহার সন্তান হয় না বলিয়া স্বামী নাকি আবার বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন। বলা বাহুল্য, এ সংবাদে কুসুমের মেজাজ আরও খারাপ হইয়া গেল।

প্রস্তাবিত সখের থিয়েটারের দল খুলিয়াছে। সীতানাথ হইয়াছেন অধ্যক্ষ। শিবনাথ কলিকাতায় গিয়াই একখানি শকুন্তলা নাটক পাঠাইয়া দিয়াছিল। নীলদর্পণ শক্ত, তাই শকুন্তলারই অভিনয় প্রথমে হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বেণী বসুর বৈঠকখানায় সকলে সমবেত হইয়া মহলা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নরহরি এক দিন এই আড্ডায় আসিয়া বলিল, "আমিও সাজবো, আমাকেও একটা কিছু পাট দাও।"

সীতানাথ বলিলেন, "আমাদের কিন্তু রিহার্শাল ভাঙ্গতে কোনও দিন রাত ১০টা, কোনও দিন রাত ১১টাও বেজে যায়। অত রাত অবধি পারবে তুমি থাকতে ?"—বলিয়া ব্যঙ্গভরে চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

নরহরি বলিল, "তা খুব পারবো।" বাস্তবিক কিছুক্ষণ গোলমালে থাকিয়া নিজের দুঃখ বিস্মৃত হওয়াই নরহরির উদ্দেশ্য। নরহরিকে রাজমন্ত্রীর পার্ট দেওয়া হইল। বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে সে অভিনয় শিক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরেই কলিকাতা হইতে শিবনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে নিজে কণ্বমুনি সাজিবে এবং অভিনয়কাল অবধি এইখানে থাকিবে। সে কলিকাতায় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে, টাকা পাঠাইলেই ড্রেস, সীন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিবে। খুব উৎসাহের সহিত মহলা চলিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে পোষাক প্রভৃতি আসিল। আগামী কল্য

রথযাত্রার দিন প্রথম অভিনয় হইবে। অদ্য ড্রেস রিহার্শাল। কিন্তু নরহরি সহসা অনুপস্থিত।

নরহরিকে ডাকিতে তাহার বাড়ী লোক ছুটিল। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তার বড় বিপদ, তার স্ত্রী ঝগড়াঝাঁটি করিয়া বাপের বাড়ী যাইতেছে। কল্য ভোরে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পৌঁছাইতে যাইবে, সেই আয়োজনে ব্যস্ত আছে।

অধ্যক্ষ মহাশয় ইহা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ড্রেস রিহার্শালে না হয় সে নাই নামিল। কিন্তু কল্য রাত্রে অভিনয়, নরহরির শ্বশুরালয় ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভোরবেলা রওয়ানা হইয়া সেই দিনই আবার কি সে ফিরিয়া আসিয়া প্লে করিতে পারিবে? অসম্ভব! সুতরাং তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য স্বয়ং তিনি নরহরির গৃহে যাইতে চাহিলেন। বলিলেন, "যাই, ব'লে কয়ে দুটো দিন যদি দেরী করাতে পারি।"

শিবু বলিল, "তার চেয়ে চলুন, আমিও যাই—গিয়ে ব্যাপারটা ভেঙ্গেই দিয়ে আসি। দু'তিন মাস হয়ে গেল—আর কেন? করনথিং আর তা'দিকে ট্রবোল দেওয়া কেন?"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "তবে তাই কর—রহস্যটা ভেঙ্গেই দাও। তা হ'লে একলাই তুমি যাও। আমাদের সেখানে থাকাটা ঠিক হবে না।" শিবু বলিল, "না, না—আপনি অন্ততঃ চলুন সঙ্গে, ঠাকুর্দ্দা।"

সীতানাথ বলিলেন, "আচ্ছা চল।"

এক হস্তে গেলাস-বাতিযুক্ত একটি দেশী লণ্ঠন, অপর হস্তে বাঁশের

লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে শিবনাথ ও সীতানাথ রওয়ানা হইয়া গেলেন।

নরহরির বাসায় পৌঁছিয়া ঠাকুর্দ্দা তাহার নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। নরহরি আসিয়া, দরজা খুলিয়া, ইঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইল।

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "হ্যাঁ হে ভায়া, তোমাদের হয়েছে কি বল দেখি!"

নরহরি মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "হবে আবার কি? ঝগড়া হয়েছে।"

"ঝগড়া হয়েছে? আমরা ত জানি, আমাদের ঘরেই স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকে। তোমরা হলে এ গ্রামের আদর্শ দম্পতি, তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটি কি রকম? এ যে বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

নরহরি বলিল, "হ্যাঁঃ—আদর্শ দম্পতি ত কেমন! আমাদের বাতাস যেন আর কোনও দম্পতির গায়ে না লাগে।"

"বটে? এমন ব্যাপার? কবে থেকে এ রকমটা তোমাদের হয়েছে?"

"মাস দুই হবে। সেই তারকেশ্বরের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা দেখে ফিরে আসা অবধি।"

"কি নিয়ে তোমাদের গণ্ডগোল বল দেখি?"

"এমন বিশেষ কিছু নয়। কা'ল রাত্রে রিহার্শাল থেকে ফিরে এসে দেখি—ও নিজের আহারাদি সেরে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্চে।

আমার ভাতের থালা মেঝের উপর রাখা। একটা ঝুড়ি চাপা দেওয়া ছিল,— ঘরে কুকুর ঢুকে ঝুড়ি ঠেলে সব খেয়ে গেছে—ভাত গুলো ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে রেখেছে। দেখে ভারি রাগ হ'ল, বিশেষ ক্ষিধের সময়। রাগ সামলাতে পারলাম না, চুল ধরে টেনে উঠিয়ে বসিয়ে পিঠে এক কিল মেরে কেবল বলেছিলাম—'দ্যাখ্ দেখি হারামজাদি! কি হয়েছে! তোর ভাইকে দিয়ে এ সব যে খাইয়ে দিলি, এই রাত্তিরে আমি কি খাই?'—এ নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেধে গেল।"

সীতানাথ বুঝাইতে লাগিলেন, "স্বামী-স্ত্রীতে বিবাদ কোন সংসারে আর নেই? তাই বলে' স্ত্রীকে বাপের বাড়ী চলে যেতে দেওয়া—এই বা কেমন কথা? দিন দুই সবুর কর না। থিয়েটারটা হয়ে যাক, তার পরই না হয়—"

নরহরি বলিল, "গিন্নীর রাগ যা হয়েছে—সে রাগ ভাঙ্গানো শিবের অসাধ্য।"

সীতানাথ বলিলেন, "বল কি ভায়া? শিব ত এখানে উপস্থিতই রয়েছেন—যদি বল ত ইনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখেন।"

সীতানাথ ও শিবনাথকে নরহরি অন্তঃপুরে লইয়া গেল। শিবনাথ গিয়াই কপট ভক্তিভরে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, "বউঠাকুরুণ, কাল ভোরে ত আপনার কোন মতেই যাওয়া হ'তে পারে না। অসম্ভব! আমরা সকলে এত ট্রবোল্ নিয়ে থিয়েটার করছি, আপনি না দেখেই চ'লে যাবেন? তা হ'লে আমাদের মনে যে বড়ই আপশোষ হবে, বউ ঠাকুরুণ!"

কুসুম ঘোমটা দিয়া অবনত মুখে বসিয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না।

শিবনাথ বলিল, "আপনি অর্ডার দেন, নরুদাদাকে রিহার্শালে নিয়ে যাই। কা'ল তখন থিয়েটার দেখে, পরশু হয়, তার পর দিন হয়, বাপের বাড়ী যাবেন এখন।"

কুসুম তাহার সেই ঘোমটায় আবৃত মস্তক প্রবলভাবে চালনা করিয়া নিজ অসম্মতি জানাইল।

শিবনাথ বলিতে লাগিল, "দেখুন বউঠাকরুণ, নরুদাদার কাছে সব হিষ্টিই শুনলাম। উনি অবশ্য আপনার সঙ্গে যা করেছেন, খুবই অন্যায় কায করেছেন। কিন্তু সেটা কি আপনার মাইণ্ড করা উচিত? আপনি ত জানেন, উনি আর জন্মে ছিলেন বাগ্দী, পুণ্যবলে এবার কায়স্থের ঘরে জন্মেছেন। এখনও সেই বাগ্দী স্বভাবই ত আছে—এক জন্ম কায়েত হ'লেই বাগ্দী কি আর জেণ্টেল্ম্যান হয়?"

শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইল এবং ঘোমটা কমাইয়া, বক্তার মুখের পানে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক নজর চাহিয়া দেখিল।

নরহরি চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কি বলছ তুমি শিবু! আর জন্মে আমি বাগ্দী ছিলাম?"

শিবনাথ বলিল, "ছিলে না? আবার ভণ্ডামী! বাগ্দী ছিলে; নুনের গোডাউনে মুটেগিরি করতে, সে কথা কি বউঠাকরুণ জানেন না ভেবেছ? তোমার পিঠের নুন আজও কাটেনি—বউঠাকরুণ তা চেটে দেখেছেন। হয় কি না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো, আপনি এ সব কথা কি ক'রে জানলেন ?"

নরহরি বলিয়া উঠিল, "কি বলছ তোমরা সব ? আমি আর জন্মে বাগ্দী ছিলাম, নুনের বস্তা পিঠে বইতাম, এই সব কথা আমার স্ত্রীকে কেউ বলেছে না কি ?"

কুসুম বলিল, "ঠাকুরপো ! তুমিই কি তারকেশ্বরে সেই গণৎকার সন্ন্যাসী সেজেছিলে ?"

নরহরি বলিল, "সে সন্ন্যাসী কি তোমার চেনা লোক ?"

শিবু বলিল, "খুব চেনা ! ওল্ড ফ্রেণ্ড ! তার কাছেই ত আমার গাঁজা খেতে শেখা ! বউ ঠাকৃরুণকে তিনি কি বলেছিলেন, তোমায় কি বলেছিলেন, সবই তাঁর নিজ মুখে আমি শুনেছি। এখানে আসবার আগের দিন, কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা। বাগবাজারের এক আড্ডায় ব'সে বাবাজী গুলী টানছিলেন। আমাকে দেখে ডাকলেন আমি এখানে আসবো শুনে তিনি বল্লেন, ওহে সেই গ্রামে নরহরিকে আর তার স্ত্রীকে কতকগুলো তামাসার কথা ব'লে এসেছিলাম—কিন্তু তার পরে ভেবে দেখলাম, কাযটা অন্যায় হয়েছে। ফরনথিং বেচারীদের একটা মনোমালিন্য হবে। তুমি সেখানে যাচ্ছ, নরহরি আর তার স্ত্রীকে বোলো, সে সব বিলকুল মিছে কথা, শুধু রঙ্গ করবার জন্যে বলা, আর তাদের এই টাকা দুটি ফিরে দিও"—বলিয়া শিবু ট্যাঁক হইতে কাগজের পুঁটুলি দুইটি বাহির করিয়া নরহরির হাতে দিল।

নরহরি খুলিয়া দেখিল, একটিতে তার স্বহস্তে লিখিত নিজ নাম-

ধাম ও জন্ম-নক্ষত্র ; অপরটিতে কোনও অপরিচিত বালক-হস্তাক্ষরে কুসুমের নামাদি লেখা।

নরহরি বলিল, "তবে তুমিই সেই গণৎকার !"

শিবু বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি ?"—বলিয়া এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যে, তাহার মৌখিক কথাটা প্রতিবাদ স্বরূপ গণ্য হওয়া কঠিন।

সব গোলমালই মুহূর্ত্তমধ্যে মিটিয়া গেল। ড্রেস রিহার্শালের সময় নরহরি দেখিল, তারকেশ্বরে গণৎকার ঠাকুরের অঙ্গে যে পোষাকটি দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই পোষাক পরিয়াই শিবু কণ্বমুনি সাজিয়াছে—সেই স্থানে সেই বেরঙা তালিটি এ পোষাকেও বিদ্যমান। রিহার্শাল অন্তে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে সে এই কথা বলিল, এবং দুই জনে খুব হাসিতে লাগিল। নিজ নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত হইল। কিন্তু সব গোলমালই সুন্দর ভাবে মিটিয়া গেল।

সুশীলা না পিপুলা ?

—:০:—
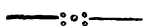
ভাগলপুরে আমার পিতা ওকালতী করিতেন, সেই স্থানেই আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ।

আমাদের বাড়ী হইতে অল্প ব্যবধানেই পিতার বন্ধু আর এক জন উকীলের বাড়ী ছিল। তাঁহার নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকালে আমি তাঁহাদের বাড়ীতে প্রায় প্রতিদিনই খেলা করিতে যাইতাম। চন্দ্রনাথবাবুকে আমি কাকা মশাই ও তাঁহারা পত্নীকে কাকীমা বলিতাম। কাকীমা'র তখনও কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি আমাকে খুবই যত্ন করিতেন;—কোলে বসাইয়া আমাকে মিঠাই খাওয়াইতেন, মুখ ধোয়াইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিয়া, আমায় পাউডার মাখাইতেন। চলিয়া আসিবার সময় মুখে চুমো খাইয়া বলিতেন, "আবার কাল এস, বাবা।" মা আমায় মারিলে কাকীমা'র কাছে গিয়াই আমি নালিশ করিতাম। তাঁহার উপর আমার আব্দার ও মান-অভিমানের সীমা ছিল না।

কিন্তু কাকীমা'র গৃহে আমার এই অত্যধিক আদর অধিক দিন রহিল না। আমার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তিনি স্বয়ং জননী

হইলেন,—একটি আধটি নয়—একসঙ্গে দুই দুইটি কন্যা তিনি প্রসব করিয়া বসিলেন। ইহাকেই বলে "রামজী যব দেতা তব ছাপ্পর ফোড়্‌কে দেতা।" আমি তখন সাত বৎসরের বালক হইলেও, ঘটনাটি বেশ স্মরণ আছে। তাহার অল্পদিন পূর্ব্বেই আমি ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম।

যাহা হউক, কাকীমা'র কন্যা দুইটি দিন দিন "শুক্লপক্ষের শশি-কলার" মতই বাড়ীতে লাগিল। আমিও ক্লাসের পর ক্লাস্ উঠিতে লাগিলাম। আমি আর বড় একটা কাকীমা'র বাড়ী যাই না একটু বড় হইলে, তাঁর মেয়ে দুটি আমাদের বাড়ী খেলা করিতে আসিতে লাগিল। একটির নাম সুশীলা, অপরটির নাম পিপুলা বা প্রফুল্লনলিনী। একে ত যমজ ভগিনী, কোনটী কে চেনাই শক্ত—তার উপর আবার তাদের মা দুষ্টামী করিয়া দুইটীকে একই রকমে সাজাইতেন। দুইটির চুল ঠিক একই রকমে বাঁধিয়া, একই রঙের ডিজাইনের ফ্রক দুইটিকে পরাইতেন, জুতা মোজা পরিলে তাহাও ঠিক একই রকমের হইত। আমাদের বাড়ীতে দুইটি প্রায় এক-সঙ্গেই আসিত। কখনও একটি একলা আসিলে বাড়ীর সকলেই জিজ্ঞাসা করিত—"সুশীলা না পিপুলা ?" যে আসিত, সে নিজের নামটি বলিত।

আমাদের বাড়ীর পশ্চাতে একটী ফুল-ফলের বাগান ছিল, আমি কখনও সুশীলাকে, কখনও পিপুলাকে, কখনও উভয়কে সেই বাগানে লইয়া যাইতাম। সকল ফলের মধ্যে পেয়ারাটাই ছিল তাহাদের অত্যন্ত লোভের বস্তু। পেয়ারা পাড়িয়া দিতাম, উভয়ে খাইত।

কখনও স্বহস্তে পেয়ারা পাড়িবার আব্দার লইত—পাকা পেয়ারা খুঁজিয়া তাহার নিম্নভাগে দাঁড়াইয়া একে একে উভয়কে আমি কাঁধে তুলিয়া বসাইতাম, তাহারা আনন্দ কলরবে পেয়ারা পাড়িত।

তখন আমার পৈতা হইয়া গিয়াছে—বয়স বারো বৎসর। সুশীলা পিপুলা পাঁচ। একদিন আমার সাক্ষাতেই কাকীমা মাকে বলিলেন, "সুশীলা কি পিপুলা, একটিকে ভাই তোমায় নিতে হবে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত, ছিলে খুড়ী হবে—শ্বাশুড়ী।" বারো বৎসর বয়সের সকল ছেলে এই কথোপকথনের অর্থ বুঝিতে পারিত কি না, জানি না; কিন্তু আমি জলের মতই বুঝিয়াছিলাম; বাল্যকালে আমি বোধ হয় একটু অকালপক্কই ছিলাম। পরদিন স্কুলে গিয়া, ক্লাসের বুজম্ ফ্রেণ্ড হরিগোপালকে জলখাবার ঘরের নিকট একাকী পাইয়া চুপি চুপি বলিলাম, "ওরে, আমার যে বিয়ে।"

হরিগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রে?"

বলিলাম, "তা জানিনে, ভাই। বোধ হয়, বড় হ'লে পাসটাস করলে।"

হরিগোপাল তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "ধুৎ, সে ত ঢের দেরী। কোথায় সম্বন্ধ শুনি? কার সঙ্গে?"

"চন্দ্রবাবুর মেয়ের সঙ্গে।"

"সেই সুশীলা পিপুলা?"

"হ্যাঁ।"

"কোন্‌টার সঙ্গে?"

"তা এখনও জানিনে, ভাই। দুটোর মধ্যে একটার সঙ্গে।"

"তা, তোর কোন্‌টাকে পছন্দ শুনি।"

"তা কি জানি ভাই, দুটোই ত এক রকম।"

হরিগোপাল আমার চেয়ে দুই তিন বছরের বড়। সে তখন সিগারেট খাইতে ও নভেল পড়িতে শিখিয়াছে। এ সব বিষয়ে আমার চেয়ে সে ঢের বেশী বিজ্ঞ। হরিগোপাল গম্ভীরভাবে বলিল, "তোর মা-বাপ যদি তোকে জিজ্ঞাসা করেন, তুই সুশীলাকে বিয়ে করবি, না পিপুলাকে বিয়ে করবি, তুই কি উত্তর দিবি, শুনি?"

"তাই ত, ভাই, কি উত্তর দেবো ব'লে দাও।"

হরিগোপাল গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "এর মধ্যে আসল কথা কি হচ্ছে, জানিস্?"

"কি?"

"আসল কথা হচ্ছে লভ্—ভালবাসা। অনেক নভেলে আমি পড়েছি, ভালবাসা ভিন্ন বিয়ে হলে সে বিয়েতে সুখ হয় না। এখন তোকে খোঁজ নিতে হবে, কে তোকে বেশী ভালবাসে—সুশীলা না পিপুলা। যে তোকে বেশী ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করবি—এ ত সোজা কথা।"

"আচ্ছা" বলিয়া আমি ক্লাসে চলিয়া গেলাম।

পরদিন রবিবার ছিল, সুশীলা-পিপুলা আসিলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোরা দুজনের মধ্যে কে আমায় বেশী ভালবাসিস্, বল্ দেখি? যে আমায় বেশী ভালবাসে, তাকেই আমি বিয়ে করবো।"

পিপুলা বলিল "আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায় তুমি বিয়ে কর সুরোদাদা।"

সুশীলা বলিল, "না সুবোদাদা, ওকে তুমি বিয়ে কোরো না— আমি তোমায় বেশী ভালবাসি, আমায় বিয়ে কর।"

পিপুলা বলিল, "হ্যাঁ তোকে বিয়ে করবে বৈ কি। তুই সে দিন সুরোদাদাকে কি ভয়ানক কামড়ে দিয়েছিলি, মনে নেই? সুরোদাদার পায়ে এখনও দাঁতের দাগ রয়েছে।"

সুশীলা মিনতিমাখা অনুতাপের স্বরে বলিল, "আর আমি তোমায় কামড়াবো না সুরোদাদা, আমাকেই বিয়ে কর তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

সুশীলা-বিষয়ে পিপুলা-কথিত অপবাদের ইতিহাসটুকু এই :— মাস দুই পুর্ব্বে পেয়ারা পাড়িবার জন্য সুশীলাকে আমি কাঁধে তুলিয়াছিলাম; নামাইবার সময় আমারই অসাবধানতা বশতঃ সে পড়িয়া যায়। এই পতনে রাগিয়া সে আমারই পায়ের গোছে এমন কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, তাহার সেই ধারালো ৩।৪টা দাঁত আমার পায়ের মাংসে প্রবেশ করিয়া রক্ত বহাইয়া দিয়াছিল। ঘা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সে ক্ষত শুকাইতে মাসখানেক লাগে।

বিবাহ জন্য দুই বোনে রীতিমত ঝগড়া বাধিয়া গেল। অবশেষে সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তখন সান্ত্বনার ছলে তাহাদিগকে বলিলাম, "আচ্ছা আচ্ছা, তোরা ঝগড়াঝাঁটি করিসনে, আমি দু'জনকেই বিয়ে করবো।"

২

ষোল বৎসর বয়সে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ-এ পড়িতে গেলাম। (তখনও ভাগলপুরে কলেজ খোলে নাই।) কালক্রমে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন কলেজে ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম।

ছুটিতে বাড়ী আসিয়া দেখিতাম, সুশীলা-পিপুলার সেই একই ভাব—অর্থাৎ কোন্‌টি কে, চিনিবার উপায় নাই। ১০।১১ বৎসরের হইলে তাহারা আর ফ্রক পরিত না—শাড়ী পরিত; কিন্তু তখনও তাহাদের মা, দুইটিকে একই পাড়ের শাড়ী ও জামা পরাইতেন। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে তাহারা পড়ে। স্কুলের গাড়ী আসিলে হিন্দুস্থানী দাই নামিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করে—"মনে আছে ভাই?"—ভিতর হইতে বালিকারা উত্তর দেয় "সীতারাম"—এবং বহি-সেলেট লইয়া বাহির হইয়া আসে,—ইহাই ছিল সেই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচলিত সঙ্কেত।

এ কয় বৎসর প্রথম প্রথম সুশীলা-পিপুলা আমার সহিত পূর্ব্বের মত মিশিত বটে, কিন্তু যতই তাহারা বড় হইতে লাগিল, ততই মেলামেশা কমিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম প্রথম আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় তাহাদের জন্য কিছু কিছু খেলনা, ছবির বই প্রভৃতি উপহার আনিতাম। শেষ দুই বৎসর আর কিছু আনি নাই। এখন তাহাদের পিতামাতা তাহাদিগকে বড় একটা বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না, কদাচিৎ আমাদের বাড়ী আসিলে তাহারা

মা'র কাছে গিয়া বসিত ; কদাচিৎ আমি তাহাদের বাড়ী গেলে কাকীমা'র সঙ্গে বসিয়া খানিক গল্প করিয়া চলিয়া আসিতাম।

পূজার ছুটি ফুরাইতে আর দুই দিন মাত্র বিলম্ব আছে। দ্বিপ্রহরে আহারের পর আমি একখানা উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম ; অপরাহ্নে ঘুম ভাঙ্গিলে মা আসিয়া আমার কক্ষে বসিলেন। দুই চারি কথার পরেই আসল কথাটি পাড়িলেন—"বাবা, ছেলেবেলা থেকে তোর ও বাড়ীর কাকীমা'র ইচ্ছে, সুশীলা পিপুলা একটির সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, এ কথা তুই জানিস ত ?—অনেক সময়েই ঘরে এ কথা আমরা বলাবলি করেছি।"

আমি বলিলাম, "জানি বৈ কি, মা।"

"এ বিষয়ে তোর কোনও অমত নেই ত ?"

"আমার মতামতের জন্যে আর কি যাচ্চে আসছে মা ?—তুমি, বাবা যা বলবে, আমি তাই করতেই প্রস্তুত আছি।"

মা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সে ত জানি, তুই আমার লক্ষ্মী ছেলে। আচ্ছা বেশ, তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ওদের বাপ একটির পাত্র স্থির করেছেন। একটি তাঁকে, একটি তোকে দিতে চান। সুশীলা পিপুলা দুজনের মধ্যে কাকে তোর পছন্দ বল্ দেখি ?"

কাহাকে আমার পছন্দ, তাহা আমি মনে মনে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলাম। তবু, মা কি বলেন শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"যমজ বোন ওরা, দেখতে ত দুজনাই সমান—তোমার কাকে পছন্দ, তাই বল।"

মা বলিলেন, "শুধু যে দেখতে দুজনেই সমান, তাই নয়। দু'-জনেরই মেজাজ, মতিগতিও সমান। আমি ত বাবা জন্মাবধি ওদের দেখছি—দোষে গুণে দুজনাই ঠিক একই রকমের। তবে, যেন মনে হয়, ওরই মধ্যে পিপুলা একটু অভিমানী। দুজনেই অভি-মানী, তবে পিপুলা যেন একটু বেশী।"

আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি ওদেরই কাহাকেও বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি সুশীলাকেই বিবাহ করিব। ছেলেবেলায় সে-ই আমায় কামড়াইয়া দিয়াছিল—তাহারই দাঁতের চিহ্ন এখনও আমার পায়ের গোছে বর্ত্তমান ; সুতরাং এক হিসাবে সে নিজস্ব বলিয়া আমায় চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর, এই কামড়ানো অপরাধের জন্য পাছে তাহাকে বিবাহ করিতে না চাই, এই জন্য ৫ বৎসরের সুশীলার সেই ব্যাকুলতা, সেই কান্না, এত দিনেও আমি ভুলিতে পারি নাই—তাহার সেই কচি করুণ মুখচ্ছবি আমার অন্তরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আর একটা কথা, তাহারও নামের আদ্যক্ষর "সু," আমারও নামের তাই, সেই জন্য আমি মনে করিতাম, বিধাতা বুঝি সুশীলাকেই আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তাই মাকে বলিলাম, "ও অভিমানী-টভিমানী দরকার কি, মা, তার চেয়ে সুশীলাই ভাল।"

মা বলিলেন, "বেশ—তাই হবে।"

সুশীলাকে আমি মনোনীত করায় পিপুলা হইল খালি। পাত্রপক্ষ যথাদিনে পিপুলাকে আসিয়া দেখিয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল। কাকীমা উভয় কন্যার বিবাহ এক দিনেই দিবার অভি-

প্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাই হইল। পিপুলাকে যিনি বিবাহ করিলেন, তিনি আমার চেয়ে বছর দুই বয়সে বড়—নাম সরোজনাথ। পাটনায় তাঁহার পিতা জজ আদালতের সেরেস্তাদার—এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর তিনিও পিতার আপিসে চাকরী পাইয়াছেন।

সুশীলার জ্যেঠা দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি আমায় সুশীলা দান করিলেন; কাকা মহাশয় সরোজকে পিপুলা দান করিলেন। কন্যাদানের আসন ও ছানলাতলা দুইটি হইয়াছিল বটে—পুরোহিতও দুই জন; কিন্তু বাসর ঘর হইল একটিমাত্র। এক বাসরে দুই বর পাইয়া, নিমন্ত্রিতা তরুণীগণ সে দিন আমোদের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন।

আমার অভিপ্রায় ছিল, ফুলশয্যার রাত্রিতে নববধূ আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমি আমোদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিব—"সুশীলা না পিপুলা?"—কিন্তু আনাড়ী আমি জানিতাম না,—সে সময় বধূর সঙ্গে কয়েক জন নিমন্ত্রিতা পুরমহিলাও আসিয়া থাকেন। সুতরাং প্রশ্নটা মুলতুবী রাখিতে হইয়াছিল। শয়নগৃহ নির্জ্জন হইলে, আমি নববধূর উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি গো, তুমি সুশীলা না পিপুলা?"

যে বর বাল্যকালে কাঁধে চড়িয়া পেয়ারা খাওয়াইয়াছে এবং যাহাকে কামড়াইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত করা হইয়াছে—নববধূ হইলেও তাহাকে লজ্জা করা একটু কঠিন বৈকি!—সে লজ্জা সুশীলা করিল না—দুষ্টামীর উত্তরে দুষ্টামী করিয়া বলিল, "কাকে পেলে খুসী হও?"

আমিই বা দুষ্টামী ছাড়িব কেন? বলিলাম, "পিপুলাকে।"

সুশীলা বলিল, "তাকে কাগে নিয়ে গেছে। এখন আর হায় হায় করলে কি হবে বল ?"

সরোজের রঙ্‌টা কিছু কাল, তাই সুশীলার এই বক্রোক্তি। পরে শুনিয়াছিলাম, দুই জামাইয়ের দেহবর্ণের পার্থক্য বিষয়ে মেয়ে-মহলে একটু আলোচনাও হইয়াছিল। সকলে বলিয়াছিল—"যেমন দুটি বোন—নিক্তির ওজনে রূপে গুণে সমান—জামাই দুটিও সেই রকম হ'লে বেশ হ'ত !"

৩

পরবৎসর, আমি আইন পাস করিয়া ভাগলপুরেই ওকালতি সুরু করিলাম।

সুশীলা বেশীর ভাগ আমাদের বাড়ীতেই থাকিত। মাঝে মাঝে "ও-বাড়ী" যাইত। উভয় ভগিনী একত্র হইলে কাকীমা—অধুনা শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী—মেয়ে দুইটিকে পূর্ব্বের ন্যায় আর সমান সাজে সাজাইতেন না। আমি আটপৌরে জামাই—পাছে অজ্ঞাতে কোন গোলমাল করিয়া ফেলি, ইহাই বোধ করি, তাঁহার আশঙ্কা ছিল।

শ্বাশুড়ীর এই সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন কিন্তু অধিক দিন রহিল না। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত একদিন সংবাদ আসিল সরোজ পাটনায় হঠাৎ কলেরা রোগে মারা গিয়াছে।

পিপুলা বিধবা-বেশ ধারণ করিয়া শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া

আসিল। যমজ দুই ভগিনীর বেশে এই হৃদয়বিদারক পার্থক্য দর্শনে আত্মীয়বন্ধু সকলেরই চক্ষুতে জল বহিল।

বৎসরখানেক মধ্যে পিতৃদেব বুঝিয়াছিলেন ওকালতি ব্যবসায়টি আমার ঠিক উপযোগী নহে; তাই তাঁহার উপদেশে মুন্সেফীর জন্য আমি আবেদন করিয়াছিলাম।

পিপুলার বৈধব্যের পর বৎসরখানেক মধ্যে পাটনা সহরে ভীষণ প্লেগ রোগ দেখা দিল এবং সেই ব্যাধিতে আমার জনক ও জননী এক সপ্তাহের ব্যবধানে, উভয়ে স্বর্গারোহণ করিলেন। এই সর্ব্বনাশে আমি মাসখানেকের উপর জড়পুত্তলিকাবৎ হইয়া রহিলাম। তাহার পর আমার মুন্সেফীতে নিয়োগবার্ত্তা গেজেট হইল। আমি ত প্রথমে উহা প্রত্যাখ্যান করিতেই প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু শ্বশুর মহাশয় আমায় অনেক করিয়া বুঝাইলেন। ফলে, ঐ পদ আমি গ্রহণ করিলাম। আসবাবপত্র কতক বিক্রয় করিয়া, কতক একটা কামরায় তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, বাড়ীটা ভাড়া দিয়া, সুশীলাকে লইয়া আমি কর্ম্মস্থান মোতিহারিতে গমন করিলাম।

এই নূতন স্থানে সুশীলার সেবা-যত্নে, পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও জীবন-যাত্রাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে আমার চিত্ত ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। কায-কর্ম্মে আমার সুখ্যাতিও হইল। ছুটিতে ভাগলপুরে যাইতাম, শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করিতাম।

সেবার পূজার ছুটীতে গিয়া দেখিলাম, শ্বশুর মহাশয়ের শরীর বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ওয়ালটেয়ারে বাড়ীভাড়া লইয়াছেন—মহাপঞ্চমীর দিন যাত্রা করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল,

পূজার ছুটীটা মাত্র সেখানে যাপন করেন ; কিন্তু শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর বিশেষ জেদাজেদিতে বড়দিনের ছুটীটা পর্য্যন্ত সেখানে কাটাইতে সম্মত হইয়াছেন। আমাকেও সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিলেন, আমিও সহজেই সম্মত হইলাম।

ওয়ালটেয়ারে যে স্থানে আমাদের বাড়ীটি লওয়া হইয়াছিল, তাহা একেবারে ফাঁকা—সহর হইতে মাইল খানেক দূরে হইবে। সেখানে সপ্তাহখানেক থাকিবার পরেই শ্বশুর মহাশয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। প্রাতে ও বৈকালে আমরা বেড়াইতে বাহির হইতাম। এখানে আসিয়াই শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী পিপুলাকে থান ছাড়াইয়া আবার পাড়ওয়ালা কাপড় পরাইলেন, হাতে দুগাছি পাতলা-সোণার চুড়ি পরাইয়া দিলেন। এ বিদেশে আর কে আছে যে, দেখিয়া নিন্দা করিবে ? ইহাতে মায়ের প্রাণে যদি একটু শান্তিলাভ হয়, এই মনে করিয়া শ্বশুর মহাশয়ও এ কার্য্য অনুমোদন করিলেন।

পূজার এক মাস ছুটি দেখিতে দেখিতে [illegible] [illegible]সিল। মোতিহারিতে ফিরিবার জন্য আমি তল্পিত [illegible] [illegible]শীলা আসিয়া আমায় বলিল, "দেখ, বাবা মার [illegible]চ্ছে, এ দুটো মাস আমি এইখানেই থাকি। তোমাকে তাঁরা ভরসা ক'রে বলতে পারছেন না।"

আমি বলিলাম, "তোমাদের কি ইচ্ছে, তাই বল।"

সুশীলা বলিল, "আর কিছু নয়,—সেখানে একলা তোমার কষ্ট হবে—নইলে দুটো মাস না হয় আমি থেকেই যেতাম।"

বুঝিলাম সুশীলার মনোগত অভিলাষ, দুই মাস এখানেই পিতা-মাতার নিকট অবস্থান করে। হাসিয়া বলিলাম "না, আমার তেমন

বিশেষ কোনও কষ্ট হবে না। তুমি দু'মাস এখান থেকে, ওঁদের সঙ্গেই ফিরো। আমি একটা রবিবারে ভাগলপুরে এসে তোমায় নিয়ে যাব এখন।"

সুশীলা বলিল, "তবে বাবা-মাকে বলিগে আমায় রেখে যেতে তোমার মত আছে।"

বলিলাম, "তা বল গে।"

৪

যথাসময়ে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলাম।

মোতিহারি জিলায় অনেকগুলি অরণ্য আছে। অরণ্যের সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হইল। আমার প্রেয়সী-হীন গৃহ আর গৃহ বলিয়া মনে হইল না, অরণ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

অতি কষ্টে দুই মাস গৃহারণ্যে কাটাইলাম। ৫।৭ দিন অন্তর সুশীলার একখানি পত্র পাইতাম—তাহাতে অরণ্যবাসের ক্লেশ কত-কটা লাঘব হইত। কবে বড়দিন আসিবে—কবে আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইব—কবে "মঝু গেহ, গেহ বলি মানব"—এই চিন্তাতেই দিনযাপন করিতাম।

পৌষের প্রারম্ভে হঠাৎ শ্বশুর মহাশয়ের একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র পাইলাম—"বাবাজী, বড়ই দুঃখের বিষয়, গত শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ হার্টফেল হইয়া পিপুলা মারা গিয়াছে। এই শোকে আমরা পাগলের মত হইয়াছি। কিছুদিন আমরা কাশীধামে গিয়া বাস করিব স্থির করিয়াছি। আগামী রবিবার সন্ধ্যা ৮টার

সময় এক্সপ্রেস গাড়ীতে আমরা মোকামা পাস করিব, তুমি যদি কিছু দিনের ছুটী লইয়া আমাদের সঙ্গ লইতে পার, তবেই বড়ই ভাল হয় বাবা! এ শোকের সময় তোমায় কাছে পাইলে আমাদের অনেক সান্ত্বনা। বিশেষ চেষ্টা করিও। এবিষয়ে অধিক আর কি লিখিব।"

পত্রখানা পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বাল্যকালে, যমজ ভগিনীর দুই জনের মধ্যে এক জনের জ্বর হইলে, অপরটিরও গা গরম হইত। উহারা বড় হইলে সেরূপ আর দেখা যায় নাই বটে,—কিন্তু—ইহা যে মৃত্যু! যদি আমার সুশীলার কিছু হয়, তবে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব?

বড়দিনের ছুটী হইতে তখনও ১৫ দিন বিলম্ব আছে। কাছারী গিয়া, জজ সাহেবকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, সোমবার হইতে বড়দিনের বন্ধের দিন পর্য্যন্ত ছুটী মঞ্জুর করাইয়া লইলাম। শ্বশুর মহাশয়কে সেই মর্ম্মে তারও করিয়া দিলাম।

যথাদিনে আমি মোকামা ষ্টেশনে শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সেকেণ্ড ক্লাসের একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া যাইতেছিলেন, আমিও সেই কামরায় উঠিলাম। শ্বাশুড়ী আমাকে দেখিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুশীলাও ঘোমটার ভিতর ফোঁপাইতেছে—বুঝিতে পারিলাম। বড় ইচ্ছা হইল, তাহার হাতটি ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনার কথা বলি, তাহার চোখ মুছাইয়া দিই; কিন্তু শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সমক্ষে তাহা করিবার উপায় নাই।

শ্বশুর মহাশয় চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিপুলার পীড়া ও চিকিৎসার কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

দানাপুর ষ্টেশনে ট্রেণ পৌছিলে, লুচি প্রভৃতি খাবার কেনা হইল। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "সুশীলা, দেখ ত মা, ঐ ব্যাগের মধ্যে পাণের কৌটায় সাজা পাণ আর আছে কি না? না থাকে ত কিনতে হবে।"—সুশীলা উঠিয়া, ব্যাগ হইতে পাণের কৌটা বাহির করিয়া, তাহা খুলিয়া পিতাকে দেখাইল—কৌটাটি শূন্য। পাণের খিলিও কেনা হইল।

শ্বাশুড়ী, দুইটি শালপাতায়, আমাদের দুই জনকে খাবার দিয়া বলিলেন, "সুশীলা, সোরাই থেকে ওঁদের দু' গ্লাস জল গড়িয়ে দাও ত মা।"

সুশীলা উঠিয়া জল গড়াইয়া দিল। আমরা আহার শেষ করিলাম। হাত ধুইয়া, পাণ খাইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া, বসিয়া রহিলাম। শ্বশুর শাশুড়ী দু'জনেই মাঝেমাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। সুশীলা এখন আর কাঁদিতেছে না। একবার যদি চোখো-চোখি হয়, এই আশায় আমি সুশীলার পানে মাঝে মাঝে চাহিতে লাগিলাম,—কিন্তু সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। তখন হঠাৎ মনে পড়িল, আমি রহিয়াছি বলিয়া সুশীলা বা শ্বাশুড়ী কেহই খাইতে পারিতেছেন না। আরা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমি শ্বশুর মহাশয়কে বলিলাম, "আমি তবে এখন ও কামরাটায় গিয়ে শুই গে।"—আমার বিছানার বাণ্ডিলটী বগলে করিয়া, আমি নামিয়া গেলাম।

৫

পরদিন কাশীধামে পৌছিয়া আমরা এক "যাত্রাওয়ালা"র বাড়ীতে উঠিলাম। দুইখানি ঘর ভাড়া লওয়া হইল। এখানে ২।১ দিন থাকিয়া একটী বাড়ী খুঁজিয়া লইবার পরামর্শ ছিল।

বাসায় জিনিষপত্র রাখিয়া ধুলাপায়ে গঙ্গাস্নান এবং বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে বাহির হওয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া পাকাদি সমাপন হইতে অপরাহ্নকাল উপস্থিত হইল। আহারান্তে বিশ্রাম। শ্বশুর মহাশয় ও আমি একটী কক্ষে শয়ন করিলাম, সুশীলাকে লইয়া শ্বাশুড়ী অপর কক্ষে রহিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে সন্ধ্যার সময় উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, আমরা তিন জনে বিশ্বনাথের আরতি দর্শনে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আর পাকাদির উদ্যোগ হইল না, বাজার হইতে লুচি, আলুর দম, রাবড়ী প্রভৃতি আনাইয়া তাহার দ্বারা জলযোগ সম্পন্ন হইল।

আহারান্তে ধূমসেবন করিতে করিতে শ্বশুর মহাশয় আমার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। আমি মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখিতেছি এতক্ষণ বোধ হয় সুশীলা ও শ্বাশুড়ীর খাওয়া হইল। এইবার বোধ হয়, শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া ও ঘরে যাইবেন এবং সুশীলাকে এ ঘরে পাঠাইয়া দিবেন। সুশীলার সঙ্গে দেখা করিবার—তাহরা সঙ্গে কথা কহিবার জন্য আমি বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক রাত এক দিন এত কাছাকাছি দু'জনে রহিয়াছি—অথচ দেখা-সাক্ষাৎ নাই। একবার মাত্র—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে

গঙ্গাস্নানের সময় আমি সুশীলার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম। দু'জনে চোখো-চোখি হইয়াছিল—কান্নায় ফোলা সে চোখ দুটি, আমার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র সুশীলা মুখখানি নামাইয়া লইয়াছিল। সুশীলাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আদর করিবার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় যখন ১০টা, শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী আমাদের কক্ষে আসিলেন। পাণ আনিয়াছিলেন, তাহা রাখিয়া বলিলেন, "তোমরা তা হ'লে শোও এখন দোর বন্ধ ক'রে।"

শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমরাও শোও গে, রাত হ'ল।"

শ্বাশুড়ী বলিলেন, "বাড়ীর কি হ'ল?"

শ্বশুর উত্তর দিলেন, "যাত্রাওয়ালা বল্লে, তার সন্ধানে দু'তিন খানি বাড়ী খালি আছে। কাল সকালে সেগুলো দেখাবে। তার পর যেটা পছন্দ হয়।"

"আচ্ছা"—বলিয়া শ্বাশুড়ী প্রস্থান করিলেন। শ্বশুর মহাশয় উঠিয়া দ্বারে খিল লাগাইয়া দিলেন।

আমি পিছু ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে মনে বড়ই চটিয়া গিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই শ্বশুর মহাশয়ের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল। আমার কিন্তু অনেকক্ষণ অবধি নিদ্রা হইল না। অবশেষে এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম,— ধুত্তোর কাশীর কাঁথায় আগুন! এখানে কি সবই উল্‌টো? বিশ্বনাথের মন্দির আলাদা, অন্নপূর্ণার মন্দির আলাদা—

আমারই বা দুঃখ করলে চলবে কেন ?—অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, যাত্রাওয়ালার সঙ্গে আমরা বাড়ী দেখিতে গেলাম। নদীয়া ছত্রে একটি বাড়ী আমাদের বেশ পছন্দ হইল। তখনই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরটি আমার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যাত্রাওয়ালা এক জন চাকর ও এক জন ঝি ঠিক করিয়া দিবার ভার লইল।

সেখান হইতে ফিরিয়া, গঙ্গাস্নানান্তে দেবদর্শনাদি সারিয়া, যাত্রাওয়ালার বাসায় আসিয়া আমরা আহারাদি করিলাম। বিশ্রামান্তে বিকালে নূতন বাসায় উঠিয়া যাওয়া গেল। বহুকাল বিচ্ছেদের পর আজ আমার সুশীলাকে পাইব জানিয়া মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে প্রণাম করিলাম।—আমার এই প্রণামটি লইয়া, বাবা বিশ্বনাথ বোধ হয় হাসিয়াছিলেন।

আরতি দেখিয়া আসিয়া, নৈশ ভোজন সমাপনান্তে যখন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম, রাত্রি তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। অধীর আবেগে আমি সুশীলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর ধীরপদক্ষেপে সুশীলা আসিয়া প্রবেশ করিল। ধীরে দ্বারটি ভেজাইয়া দিল। জন্মদরিদ্র ব্যক্তি সহসা মহারত্ন লাভ করিলে যেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইয়া পড়িল।—আমার মুখ দিয়া হঠাৎ সেই পুরাতন রসিকতা বাহির হইয়া পড়িল—"সুশীলা না পিপুলা ?"—কথাগুলি উচ্চারণমাত্র সকল কথা আমার মনে পড়িল—

আমি মরমে মরিয়া গেলাম। ছি ছি, আমি কি একটা মানুষ, না পশু?

মেঝের উপর আমার বিছানা পাতা ছিল। সুশীলা সজল নয়নে ধীরে ধীরে বিছানার দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু বিছানায় আসিল না; কিছু দূরে, মেঝের উপর বসিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "আমায় মাফ্ কর সুশীলা, আমার বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। পিপুলা আজ নেই—আজ ওরকম রসিকতা করা আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে!"—বলিয়া তাহাকে টানিয়া বিছানায় লইবার জন্য বাহু বাড়াইলাম।

সুশীলা হঠাৎ দূরে সরিয়া বলিল, "আমায় ছুঁয়ো না।"

তাহার এই ভাব দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, আমি তোমায় ছোঁব না কেন সুশীলা?"

উত্তর—"আমার পানে বেশ ক'রে চেয়ে দেখ দেখি—আমি কি তোমার সুশীলা?"

তাহার মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভয়ে আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "নিশ্চয়ই তুমি আমার সুশীলা।"

উত্তর পাইলাম—"না, আমি তোমার সুশীলা নই। তোমার সুশীলাকে ওয়ালটেয়ারে চিতার আগুনে পুড়িয়ে এসেছি। আমি হতভাগিনী পিপুলা।"—বলিয়া সে চোখে অঞ্চল দিল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কক্ষচ্যুত হইয়া যেন আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি নারায়ণ স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদিলাম। আমার দেহ

কাঁপিতে লাগিল। আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—শয্যায় এলাইয়া পড়িলাম।

প্রায় পাঁচ মিনিটকাল এইরূপ বিহ্বল হইয়া ছিলাম। তাহার পর আবার চক্ষু খুলিলাম। একদৃষ্টে সুশীলা বা পিপুলা যেই হোক —তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।—সুশীলাই ত—কে বলিল পিপুলা? অন্যে দুই জনের পার্থক্য বুঝিতে না পারুক,—যাহার সঙ্গে আমি ছয় বৎসর ঘর করিয়াছি—তাহার সম্বন্ধে আমারও কি ভ্রম হওয়া সম্ভব? বলিলাম, "তোমার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস, সুশীলা?"

"পরিহাস নয়। সত্যিই সুশীলাকে যমে নিয়ে গেছে।"

"তবে যে বাবা আমাকে লিখেছিলেন, পিপুলা মারা গেছে।"

"বাবার তখন মাথার ঠিক ছিল না, তাই ওরকম লিখেছিলেন।"

"কি বল তুমি?"

"যা সত্য ঘটনা, তাই আমি তোমায় বলছি। সুশীলাকে পুড়িয়ে এসে, পরদিন বাবা মাকে বল্লেন—এখানে আমাদের কেউ চেনে না —সুশীলা মরেনি, হতভাগিনী পিপুলাই মরেছে। এ বয়সে পিপুলার বৈধব্যবেশ আমি চোখে দেখতে পারছিলাম না—দিন-রাত আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছিল। আজ থেকে ও আর পিপুলা নয়, ও সুশীলা—ও গিয়ে ওর স্বামীর ঘর করুক।"

আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না জাগিয়া আছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম, "মা শুনে কি বল্লেন?"

"মা বল্লেন, ছি ছি, তাও কি হয়? পিপুলা সুশীলা সেজে গিয়ে স্বামীর ঘর করবে কি? জামাই কি এ জাল ধরতে পারবে না?

বাইরের লোক না পারুক, তুমি আমি যেমন ঠিক চিনি কোন্‌টি পিপুলা, জামাইও নিশ্চয় সেই রকম চিনবে যে, এ সুশীলা নয়। তখন কি উপায় হবে? আর যদি ধর, জামাই চিনতে না-ও পারেন,—হিঁদুর মেয়ের পরলোক ব'লেও ত একটা জিনিষ আছে? জালিয়াতী ক'রে, ইহলোকে দু'দিন না হয় পিপুলা সুখভোগ ক'রে নিলে। তারপর—পরলোকে কি উপায় হবে?"—বলিয়া পিপুলা চুপ করিল।

আমিও কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলাম, "তারপর?"

"তারপর বাবা বল্লেন, 'আমি তোমাদের ও সব পরলোক-ফরলোক মানিনে।' মা বল্লেন, 'তা না মানতে পার, কিন্তু মানুষে মানুষে সত্য ব্যবহার আর জালজুয়াচুরির মধ্যে কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম—তা ত মান?' বাবা বল্লেন, 'তা মানি বটে।' শেষকালে বাবাতে মায়েতে পরামর্শ হ'ল, স্ত্রীবিয়োগ হ'লে অনেকেই ত ছোট শালীকে বিয়ে করে। এই কাশীতে অনেক তান্ত্রিক সাধক, অনেক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের মধ্যে এক রকম বিবাহ প্রচলিত আছে তার নাম শৈব বিবাহ। তোমার মত ক'রে, এখানে তোমাতে আমাতে শৈব বিবাহ দেওয়ার জন্যেই বাবার কাশী আসা। তোমার এ বিষয়ে মত কি, তাই জানবার জন্যে বাবা মা আমায় আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

আমি কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না—চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। কে এ? কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছি?

সুশীলা এ নয়, কে বলিল? সুশীলা আর পিপুলা—কোন্‌টি কে? তফাৎই বা কি? এ ত ঠিক আমার সেই সুশীলার মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "আমি পিপুলা"—এ কথা না বলিলে, আমি ত ইহাকে সুশীলা বলিয়াই গ্রহণ করিতাম।

চোখ খুলিলাম। পিপুলা সেই ভাবেই বসিয়া আছে। তাহার মুখখানি বড় বিষণ্ণ। আমি তাহাকে গ্রহণ করিব, না প্রত্যাখ্যান করিব—এই সংশয়েই কি?

বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার মত কি বল?"

পিপুলা বলিল, "আমি জানিনে।"—বলিয়া সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই সে উঠিয়া প্রস্থান করিল।

* * * *

সপ্তাহ পরে, অতি গোপনে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে আমাদের উভয়ের শৈব বিবাহ হইল। পুরোহিত হইলেন, নদীয়াছত্র নিবাসী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রথম মিলন-রাত্রিতে পিপুলা বলিল, "মনে আছে তোমার? ছেলেবেলায় আমরা দু' বোনেই তোমায় বিয়ে করবার জন্যে কেঁদেছিলাম—তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?"

আমি বলিলাম, "মনে আছে। বলেছিলাম, কাঁদিস্‌নে—আমি তোদের দুজনকেই বিয়ে করবো।"

পিপুলা বলিল, "তাই করলে, তবে ছাড়লে!"

পিপুলার নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইল। যাহাকে বিবাহ করিলাম—জনসমাজে সে-ই সুশীলা বলিয়া পরিচিত হইল।

আমাদের একটি কন্যা জন্মিয়াছে। তাহার বিবাহের সময় কি হইবে, এই সমস্যা মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়।

ঠকাইয়া কাহাকেও মেয়ে দিব না। যাহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করিব, আসল কথা সমস্তই তাহাকে খুলিয়া বলিব। সুতরাং একটি উচ্চশিক্ষিত উদারমতাবলম্বী সুপাত্রের প্রয়োজন। তবে এখনও তাহার দেরী আছে। কন্যাটি আমার দেড় বৎসরের মাত্র।

বিলাতী রোহিণী

—○*○—

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ফারম্ ঘোষ এণ্ড চাটার্জ্জি কোম্পানির অংশীদার ও কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, চা পান কার্য্য সমাধা করিয়া, বেলা ৮টার সময় বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ, জ্বলন্ত কলিকাযুক্ত রূপার গুড়গুড়ি হস্তে খানসামাও নামিয়া আসিল। পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষাতের অভিলাষে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন; বাবু প্রবেশ করিতেই তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া, বাবু একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া, আরামে গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে, ভদ্রলোকগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

মিনিট পনেরো কাল এইরূপ চলিলে, ডাকপিয়ন আসিয়া সেলাম করিয়া, বাবুর হস্তে কয়েকখানি পত্র দিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্যবাবু বলিলেন, "বিলাতী ডাক যে! এবার খুব সকালেই এসেছে ত!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া পিয়ন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বাবু তখন সেগুলি হইতে বাছিয়া, একখানি খুলিয়া, পাঠে প্রবৃত্ত

হইলেন। এখানি তাঁহার একমাত্র পুত্র, বিলাত-প্রবাসী শ্রীমান সুধাংশুভূষণ লিখিয়াছে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সত্যবাবুর মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্রোধ ও বিরক্তিতে ললাটদেশ সঙ্কুচিত ও নাসিকাগ্র স্ফীত হইতে লাগিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে, সেখানি তিনি টেবিলের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন ভদ্রলোক সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও মন্দ খবর নয় ত?"

সত্যবাবু সেকথার কোনও উত্তর না দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বসুন, আমি একটু ভিতর থেকে আসি"—বলিয়া চিঠিখানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। একজন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অপর একজন উত্তর করিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

বাবু উপরে গিয়া, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

স্বামীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? ভাল আছে ত?"

"এই দেখ"—বলিয়া সত্যবাবু পত্রখানি স্ত্রীর হস্তে দিলেন।

গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন—

১৪৮নং কুইন্‌স্ রোড
লণ্ডন (W)
১২ই আগষ্ট……

শ্রীচরণেষু,

গত রবিবার আপনার পত্র এবং টাকার ড্রাফ্‌ট্‌ পাইয়াছি। আপনারা সকলে কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

বাবা, গত কয়েক সপ্তাহ হইতে, লিখি লিখি করিয়া একটি কথা আপনাকে লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সে কথা আর আপনাদের নিকট গোপন রাখা আমার উচিত হইবে না, তাই আজ লিখিতেছি।

বিগত গ্রীষ্মের বন্ধের সময়, আমি যখন ব্রাইটনে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলাম, সেই সময় সমুদ্রস্নানকালে একটি যুবতীর জীবন বিপন্ন হয়। আমিও স্নান করিতেছিলাম, আমি অনেক কষ্টে সেই যুবতীর জীবনরক্ষা করি। সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি জানিতে পারি যে তাহার নাম নোরা ডাড্‌লি, সে লণ্ডন ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করে, আমারই ন্যায় গ্রীষ্মের বন্ধে সমুদ্রতীরে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়া কোনও বোর্ডিংএ বাস করিতেছে। তাহার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, শিশুকাল হইতেই বাপ মা নাই, নটিংহাম-শায়ারে তাহার এক পিতৃব্য থাকেন, এতদিন তিনিই উহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বলিয়া, বৎসর খানেক হইতে নোরা লণ্ডনে আসিয়া চাকরি করিতেছে। ক্রমে তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ

হইতে লাগিল। প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইত। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াও সেইরূপ।

আমি প্রতিদিন বিকালে তাহার আপিসের ছুটির পূর্ব্বে, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি। সে আসিলে, দুইজনে একত্র বেড়াইতে যাই; কোন কোন দিন কোনও সাধারণ ভোজনাগারে সান্ধ্যভোজনও একত্র সমাধা করি।

বাবা, আপনি ত জ্ঞানী ব্যক্তি। আপনি ত জানেন এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার পরিণতি কিরূপ দাঁড়ানো সম্ভব ও স্বাভাবিক। যাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে না পাইলে, আমার জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নোরার অবস্থাও তদ্রূপ। একদিন বিকালে কার্য্যবশতঃ আমি যথারীতি তাহার আপিসের নিকট গিয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। সে অনেকক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া, আমার বাসায় আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল; বাসায় আমার কোনও সংবাদ না পাইয়া, বাসার সামনে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছিল; অবশেষে নিজ বাসায় ফিরিয়া গিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়ে, সে রাত্রে সে কিছুই খায় নাই! পরদিন সন্ধ্যার পর হাইড্‌পার্কে এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল!

বাবা, এই সব কথা লিখিলাম বলিয়া আমাকে আপনি নির্লজ্জ ও বাচাল মনে করিবেন না। এসব কথা আমার লিখিবার উদ্দেশ্য, আপনাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। যদিও আপনি একবার

বিলাতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন ছিলেন না। ইংরাজললনা হইয়াও নোরা যারপর নাই কোমলহৃদয়া ও প্রেমময়ী। আপনাদের —শুধু আপনাদেরই বা বলি কেন, অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় নরনারীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, মেমেরা একান্ত পাষাণহৃদয়া হয়, এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম তাহাদের আদৌ অজ্ঞাত। নোরাকে আমি বিবাহ করিলে, আদর্শ হিন্দুপত্নীর মতই যে সে আমাকে ভক্তি ও সেবা করিবে, সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই যে সে অনুসরণ করিবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনাদের প্রতিও সে যে যথেষ্ট ভক্তিমতী হইবে তাহাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল। কথায়-বার্ত্তায় আপনাকে "পাপা" এবং মাকে "মাম্মা" বলিয়াই সে উল্লেখ করিয়া থাকে।

বাবা, অবস্থা সমস্তই খুলিয়া লিখিলাম। আমি জানি আপনি উদার, মহৎ, কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা কুসংস্কার আপনার নাই। তাই সাহস করিয়া সকল কথা আপনাকে লিখিয়া, এ বিবাহে আপনার ও মাতৃদেবীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ আমি ভিক্ষা করিতেছি। পাঠ শেষ হইতে আমার এখনও দুই বৎসর বাকী আছে। ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া, আগামী ডিসেম্বর মাসে আমরা বিবাহ করা স্থির করিয়াছি। সে সময় আমার হাজার দুই টাকা আবশ্যক হইবে। বিবাহের পর আমার এলাউন্স বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, কারণ, তখন আর আপনার পুত্রবধূকে চাকরি করিতে দেওয়া শোভন হইবে না। আমরা যতদূর সম্ভব

মিতব্যয়িতার সহিত গৃহস্থালী নির্ব্বাহ করিব। নোরা খুব শক্ত মেয়ে, একটি পয়সা তাহার হাতে অপব্যয় হইবার যো নাই।

এই পত্র অদ্য হইতে তিন সপ্তাহ মধ্যে আপনার হস্তগত হইবে। ডাকে ইহার উত্তর আসিতে আরও তিন সপ্তাহ লাগিবে। অতদিন অপেক্ষা করিতে হইলে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। তাই মিনতি করিতেছি, মাতৃদেবীর সম্মতি লইয়া, মাত্র দুইটি কথায় আমায় একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন। বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাইবার মাশুল অত্যন্ত অধিক, সুতরাং বিস্তারিত ভাবে সকল কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যদি শুধু দুটি কথা "Bless you" (আশীর্ব্বাদ করি) টেলিগ্রাম করিয়া দেন, তবে আমি আপনার ও জননীদেবীর সম্মতির ও আশীর্ব্বাদ পাইলাম বলিয়া বুঝিব, এবং নিশ্চিন্ত হইব। আপনি আমার শতকোটী প্রণাম জানিবেন ও মাতৃদেবীকে জানাইবেন। আপাততঃ বিদায়।

আপনাদের চির স্নেহের

সুধা

গৃহিণী এই পত্রখানি যখন পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। কিয়দংশ পড়িবার পর, তাঁহার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তিনি নিকটস্থ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। পত্রপাঠ শেষ করিয়া স্বামীর দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে?"

সত্যবাবু বলিলেন, "এ বিয়ে যেমন করে হোক বন্ধ করতেই হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা তো বটেই! কিন্তু কি উপায়ে বন্ধ করবে? কেঁদে কেটে, ভয় দেখিয়ে, তুমি আমি দু'জনে যদি তাকে বারণ করে চিঠি লিখি তা হ'লে সে কি শুনবে না?"

কর্ত্তা বলিলেন, "মাগীকে নিয়ে হারামজাদা যে রকম মস্‌গুল্ হয়ে আছে, মানা করলেই যে শুনবে এমন ত বোধ হয় না।"

"তবে?"

"সেই কথাই ত ভাবছি। একটা কোন উপায় করতেই হবে। মেম বিয়ে করে নিয়ে এলে, এদেশে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না যে! না দেশী সমাজে, না বিলাতী সমাজে, কোন সমাজেই সে যে মুখ পাবে না। পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা পর্য্যন্ত লোপ হবে। দেখদেখি নচ্ছার বেটার আক্কেল খানা! উনি জানেন আমি উদার মহৎ, আমার ভিতরে কোন রকম কুসংস্কার নেই! আরে, মুর্গীই না হয় খাই, তাই বলে কি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি, আর তোকে মেম বিয়ে করতে অনুমতি দেবো? কি রত্নই পেটেধরেছিলে গিন্নী!"

গিন্নী বলিলেন, "তুমি না হয় নিজেই একবার যাবে? গিয়ে ছেলেকে ধরে' নিয়ে আসবে?"

সত্যভূষণবাবু পূর্ব্বে যে বিলাত গিয়াছিলেন, তাহা সুধাংশুর পত্রেই প্রকাশ। কারবার সংস্পৃষ্ট ব্যাপারে তিনমাসের জন্য একবার তাঁহাকে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বার যাইতে কোনও আটক নাই।

সত্যবাবু বলিলেন, "মেরে ধরে তাকে নিয়ে আসবো ? সে কি আর কচি খোকাটি আছে যে গালে একটা চড় কষিয়ে কাণ ধরে' হিড়হিড় করে টেনে আনবো ? রাস্কেল শূয়ার কোথাকার ! সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই সে অনুসরণ করবে ! খুঁজে খুঁজে কি সীতা সাবিত্রীই বের করেছে বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড—বাঃ ! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সে দেশে চাকরি করা মেয়েরা যে কেমন সীতা সাবিত্রী সে আর আমার জানতে বাকী নেই।"

বিলাতে প্রবাসকালে স্বামীর ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্বন্ধে গৃহিণী মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া থাকেন। অন্য সময় হইলে শেষের এই কথাটি লইয়া আজ তিনি স্বামীকে একটু পরিহাস না করিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু ইহা পরিহাসের সময় নয়। তিনি ভীতভাবে বলিলেন, "সে কি গো ? ছুঁড়ি কি তা হলে—গৃহস্থের মেয়ে নয় ?"

কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ককৃখনো নয়। ও খুড়ো ফুড়ো সব ঝুট বাত। দেশে তার খুড়োখুড়ি থাকলে, ছুটির সময় সে সেইখানে গিয়ে কাটাতো—কাপ্তেন খুঁজতে ব্রাইটনে যেত না। তোমার ছেলেটিকে যেমন পেয়েছে গাধারাম ! শুনেছে মস্ত বড়-লোকের একমাত্র ছেলে, গেঁথে ফেলেছে। বেটা, খাচ্চিস খা, আবার ছাঁদা বেঁধে আনার দরকার কি বাপু ? বামুনের ছেলে কিনা, ছাঁদা বাঁধা ভুলতে পারে নি ! করুক না বিয়ে, করে' এক-বার মজাটি দেখুক। একটি পয়সা দেবো না, ত্যজ্যপুত্র করবো। বিয়ের সময় খরচের জন্যে দুহাজার টাকা চাই ! আব্দার দেখনা একবার ! হতভাগা পাজি ছুঁচো হনুমান।"

আপিসের বেলা হইয়া যায়। স্নানাহার করিয়া সত্যবাবু আপিসে গেলেন। আহার—পাতের কাছে বসাই সার হইল। গৃহিণী ত সারাদিন শয্যা লইয়া রহিলেন।

২

আপিসে গিয়া, সত্যবাবু পুত্রের চিঠিখানি আর একবার পাঠ করিলেন। ছেলে লিখিয়াছে, দুইটিমাত্র কথা তার করিয়া দিবেন—"Bless you"। সত্যবাবু, একখানি বিলাতী টেলিগ্রামের ফর্ম্ম্ লইয়া, রাগের মাথায় তৎপরিবর্ত্তে লিখিলেন "Damn you" (উচ্ছন্ন যাও)। ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, চাপরাশি আসিয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রামখানা তাহার হাতে দিবার জন্য উঠাইলেন; আবার নামাইয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, এরূপ টেলিগ্রাম পাইয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্যে ছেলে যদি বিবাহই করিয়া বসে! তা ছাড়া, টেলিগ্রামখানা এই দীর্ঘযাত্রাপথে যে সকল কর্ম্মচারী ও কর্ম্মচারিণীর হাতে পড়িবে, তাহারাই বা ভাবিবে কি! একজনকে মাত্র গালি দিবার জন্য, ৫০। ৬০ টাকা যে ব্যয় করিয়াছে, তাহাকে লোকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি মনে করিবে? তাই তিনি সেখানা ছিঁড়িয়া, অন্য একখানা টেলিগ্রাম লিখিলেন, তাহাতে শুধু একটি মাত্র শব্দ রহিল—"Wait" (সবুর)।

সন্ধ্যার পর সত্যবাবুর মোটর, বালিগঞ্জে এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেনের গৃহের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি সত্যবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সেন সাহেব তখন রাত্রিবসন পরিধান করিয়া লাইব্রেরী গৃহে একখানা আরাম কেদারায় পড়িয়া, চশমা চোখে দিয়া

বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার মুখে পাইপ, পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "হঠাৎ যে! খবর কি হে?"

সত্যবাবু পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সেন সাহেবের হাতে দিলেন। সেন তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ যে জবর খবর! তা, টেলিগ্রাম করে দিয়েছ ত?"

কি টেলিগ্রাম করিতে যাইতেছিলেন, সেখানা ছিঁড়িয়া কি টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই রকমই সত্যবাবু বলিলেন। শেষে বলিলেন, "উপায় কি করা যায় বল দেখি? আমি ত নিজে যাওয়া একরকম স্থিরই করেছি। সেখানে গিয়ে কি রকম কার্য্য প্রণালীটা অবলম্বন করি বল দেখি?"

"নিজে যাচ্ছ? তাহ'লে আর ভাবনাটা কি? কিছু টাকা খরচ করলেই হল।"

"কি করবো? ছুঁড়িকে কিছু টাকা দিয়ে, তাকে ভাগিয়ে দেবো?"

সেন সাহেব হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়া বলিলেন, "উঁহু! সে সুবিধে হবে না। ছুঁড়ি কি রাজি হবে? সে হয়ত ভাববে, বিয়ে হলে এই বুড়োর ষোল আনা সম্পত্তিই ত আমার; এখন দু' কি পাঁচ হাজার নিয়ে কি হবে? কিংবা, সে টাকাও নিতে পারে, বিয়ে করবার মৎলবও পরিত্যাগ না করতে পারে। তার চেয়ে বরঞ্চ এক কায কর না, সত্য!"

সত্যবাবু সাগ্রহে বলিলেন, "কি?"

"দাঁড়াও"—বলিয়া তিনি গ্লাস তুলিয়া সেটা খালি করিয়া বলি-লেন, "তোমাকেও একটা পেগ দিক্ ?"

সত্যবাবু সম্মতি জানাইলে, বয়কে ডাকিয়া দুইটা পেগ দিতে আদেশ করিলেন। পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল পড়েছ ত ? গোবিন্দলালের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াবার জন্তে ভ্রমরের বাপ মাধবীনাথ যে ফন্দি করেছিলেন, তুমিও তাই কর না কেন ?"

সত্যবাবু বলিলেন, "নিশাকর পাই কোথা ?"

"নিশাকর হবার মত একটি লোক আমার হাতে আছে।"

"কে ?"

"নবীন দত্ত। হীরু দত্তের ছেলে নবীন দত্ত। বছর ৫।৭ হত-ভাগাটা বিলাতে ছিল ; শুধু স্ফূর্ত্তি করেই বেড়িয়েছে—পাস টাস কিছু করতে পারেনি। বিলাতে যে কত লীলা সে করে' এসেছে তার সংখ্যা নেই। একবার না দু'বার তার জেল পর্য্যন্ত হয়েছিল। বাপ মারা যাবার পর টাকার অভাবে দেশে ফিরে এসেছে—এখন বেকার অবস্থায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরছে। সে যে রকম বদমাইস, কিছু থোক্ টাকা পেলে স্বচ্ছন্দে রাজি হবে এখন। কায হাঁসিল করে আসবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "টাকা খরচ করতে আমি রাজি আছি।"

"তাকে তার মেহনতানা দিতে হবে। তারপর, সরঞ্জামি খরচ। সে একটা রাজাটাজা নবাবটবাব সেজে, ছুঁড়িকে হাত করে নেবে কিনা! সুতরাং তাকে একটু লম্বা হাতেই টাকা খরচ করতে হবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "বুঝেছি। টাকার জন্তে আট্‌কাবে না। সে লোক কোথায়, তাকে একবার ডাকাও।"

সেন বলিলেন, "সে কি এখন আসবে? সে এখন ক্লাবে বসে পেগ টানছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বরঞ্চ তাকে এখানে আনিয়ে রাখবো, তুমি সন্ধ্যের পর এস। তার বায়না স্বরূপ একটা চেকও সঙ্গে এন।"

"বেশ, তাই আনবো।"

দুই চারিটি অন্যান্য কথার পরে সত্যবাবু উঠিলেন।

পরদিন সত্যবাবু যথাসময়ে বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া, দত্ত সাহেবের দেখা পাইলেন। দত্ত রাজি। ইংরাজিতে বলিল, "এ আর একটা শক্ত কথা কি? সে ঠিক হয়ে যাবে এখন। আমাকে কিন্তু নবাব সাজতে হবে। নবাবোচিত সকল সরঞ্জামই চাই। অন্য সব জিনিষ সেখানেই পাওয়া যাবে, কেবল একটা জমকালো রকমের রূপোর গুড়গুড়ি, লক্ষ্ণৌয়ের খানিকটে সুগন্ধি তামাক, আর কিছু টিকে, এখান থেকে সঙ্গে নিতে হবে। আর, একটা ফেজ ক্যাপ।"

তিন জনে বসিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। ইত্যবসরে দত্ত আধ বোতলের উপর উদরস্থ করিয়া ফেলিল। সত্যবাবুর নিকট টাকা লইয়া সে যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাহার পা একটুখানি টলিলও না।

৩

দত্তসাহেবকে সঙ্গে লইয়া, পি-এণ্ড-ও কোম্পানির মল্‌ডেভিয়া নামক মেল ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া, যথাসময়ে সত্যবাবু লণ্ডনে

আসিয়া পৌঁছিলেন। ঐ মেলেই, সত্যবাবু লিখিত একখানি পত্র সুধাংশুর নামে আসিয়া পৌঁছিল, তাঁহাতে "হাঁ, না" কিছুই নাই, আছে শুধু তাহার প্রণয়িনী সম্বন্ধে গুটিকতক ফাঁকা প্রশ্ন,—কেমন বংশ, খুড়া কিরূপ লোক ইত্যাদি। সময় লইবার ফিকির—আর কিছু নয়।

ট্রেণ হইতে নামিয়া উভয়ে একটা হোটেলে গিয়া উঠিলেন। পরদিন প্রাতে, দত্ত বাসা খুঁজিতে বাহির হইল এবং একটু দূর অঞ্চলে বাসা ঠিক করিয়া, সত্যবাবুকে সেখানে লইয়া গেল। সত্যবাবু যে লণ্ডনে আসিয়াছেন, এখন সুধাংশুকে তাহা জানিতে দেওয়া অভিপ্রেত নহে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, দত্ত বাহির হইয়া, লণ্ডন ব্যাঙ্কে গিয়া উপস্থিত হইল। কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী, ভিতরে বসিয়া কায করিতেছে—গরাদের ভিতর দিয়া তাহাদের সকলকেই দেখা যায়। ১৯।২০ বৎসর বয়সের মেয়ে অনেকগুলিই রহিয়াছে, কোন্‌টি নোরা, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। দত্ত তখন ব্যাঙ্কের একজন ছোক্‌রাকে ডাকিয়া, তাহার হস্তে একটি শিলিং গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "ওহে ছোক্‌রা, একটু এদিকে এস ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

অর্থলাভে খুসী হইয়া, দত্ত বাহির করিয়া, বালক দত্তসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে একটা নিভৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যাঙ্কে মিস্ ডাড়্‌লি নামে যে একটি যুবতী চাকরি করে, তা'কে তুমি চেন?"

বালক বলিল, "নোরা ডাড্‌লি ত? খুব চিনি। ডাকিয়া দিব?"

"হাঁ—দাও ত।"

বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, যে সকল যুবতী বসিয়া টাইপ-রাইটিং-এর কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের কাণে কাণে কি বলিল। বলিতেই, সেই যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বাহিরের ভিড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দত্ত ভিড়ের আড়ালে লুকাইয়া সেই যুবতীকে দেখিতে লাগিল। যুবতী, বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া তখন দত্ত সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বাস্তবিক, নোরার সঙ্গে দেখা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; দেখা হইলে, সে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কেন মহাশয়? তখন কি উত্তর দিবে? উদ্দেশ্য—তাহাকে চেনা, এবং ব্যাঙ্কে সে কি কার্য্য করে তাহা জানা। উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে।

দত্ত, সেখান হইতে সোজা ফ্লীট ষ্ট্রীটে গেল। সেখানে অনেক সংবাদপত্রের আফিস। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে, উপর্য্যুপরি তিন দিন প্রভাতে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দিল:—

WANTED.

অবসর সময়ে টাইপ-রাইটিং কার্য্যের জন্য একটি যুবতীর প্রয়োজন। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা, দুই ঘণ্টা কার্য্য করিতে হইবে। বেতন সপ্তাহে ৪ গিনি। বয়স ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ সহ আবেদন করুন।

বক্স নং······C/o ম্যানেজার·········

বিজ্ঞাপন দিয়া, পাঁচটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে দত্ত আবার ব্যাঙ্কের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন ভারতবর্ষীয় যুবক, একস্থানে দাঁড়াইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। পাঁচটার পরেই ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণসহ নোরাও বাহির হইয়া আসিল। যুবক তাহাকে দেখিবামাত্র টুপী উত্তোলন করিল; উভয়ের করমর্দ্দন হইল; অল্পদূরে দাঁড়াইয়া দত্ত শুনিল, নোরা বলিতেছে, "সিউডা, আজ বেলা ৩টার সময় তুমি কি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলে?" সুধা বলিল "কৈ না!" নোরা বলিল, "আজ বেলা ৩টার সময় ব্যাঙ্কের একজন ছোক্‌রা আসিয়া বলিল, কোনও কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোক তোমায় ডাকিতেছেন। ভাবিলাম, নিশ্চয় তুমিই কোনও দরকারে আসিয়াছ। বাহিরে আসিয়া তোমায় কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ছোকরাটাও চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, কৈ তাঁকে ত দেখিতেছি না।"

সুধা বলিল, "আর কেহ বোধ হয় আর কাহাকেও খুঁজিতে-ছিল।"

"তাই হইবে"—বলিয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গেল। দত্ত মনে মনে হাসিয়া, অম্‌নিবাসে উঠিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে, চারিখানি সংবাদ পত্রের আফিস হইতে চার বোঝা আবেদন পত্র আসিয়া পৌছিল। দত্ত সেগুলি গণিয়া দেখিল, দুই হাজারেরও উপর। সত্যবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত?" দত্ত বলিল, "হবে না? সারাদিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা

খাটুনী খেটে সপ্তাহে দেড় গিনি দু'গিনির বেশী পায় না; এটা, অবসর সময়ে ঘণ্টা দুই কায করেই চার গিনি! তা ছাড়া, নিয়োগ-কর্ত্তা ধনী ও অবিবাহিত হ'লে, অনেক সময় টাইপ্‌রাইটিং ছুঁড়ির সঙ্গে বিয়েও হয়ে যায়।—সেও একটা ফিউচর্‌ প্রস্পেক্ট্‌ (ভবিষ্যৎ আশা) আছে ত!"

উভয়ে তখন পত্রগুলি ভাগাভাগি করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আবেদনকারিণীর নামটি মাত্র দেখিয়াই, সেখানা ছিঁড়িয়া ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টাকাল বৃথা পরিশ্রমের পর, দত্ত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এই দেখ।—লণ্ডন ব্যাঙ্কের নোরা ডাড্‌লি।—বয়স ১৯ বৎসর। মার দিয়া কেল্লা!"

সত্যবাবু পত্রখানি লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। বলিলেন, "সেই হারামজাদিই বটে। বেটী মূর্খ—দেখ না এইটুকু চিঠির মধ্যে কতগুলো বানান ভুল!"

দত্ত বলিল, "মূর্খ না ত কি! সে যাক্‌। তোমার ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করেই অবশ্য এ দরখাস্ত করেছে। সন্ধ্যা বেলাটাই ওদের লীলা খেলার সময় কি না; তোমার ছেলে যে মত দিলে বড়?"

সত্যবাবু বলিলেন, "বোধ হয় ভেবেছে, বাবার চিঠিতে তেমন উৎসাহ ত কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত ফেরবার আগে ভিন্ন বিবাহই হবে না। সন্ধ্যের পর দু'ঘণ্টা বৈত নয়! ৬টা থেকে ৮টা ইতিমধ্যে ফাঁকতালে যা রোজগার হয়ে যায়।"

দত্ত বলিল, "তাই বোধ হয় ওদের পরামর্শ।"

৪

সত্যবাবুকে পূর্ব্ব বাসায় রাখিয়া, দত্ত সাহেব কেনসিংটন গার্ডেন্সে আসিয়া উচ্চ ভাড়ায় নূতন বাসা স্থির করিল। ঘরগুলি পূর্ব্ব হইতেই বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত ছিল, নবাবোচিত কতকগুলি জিনিষও সংগৃহীত হইয়াছে। আহারাদির বন্দোবস্তও ধনীজনোচিত। এখানে আসিয়া দত্ত নিজের নাম বলিয়াছে—"নবাব অব্ পান্নাগড়।" একজন খানসামা (valet) নিযুক্ত করিয়াছে; এবং মাসিক ভাড়ায় একখানা দামী রোল্স্ রয়েস্ মোটর গাড়ীও নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর এই জাল নবাবটী, নকল পান্নার গোটাকতক আংটি আঙুলে পরিয়া, রূপার গুড়গুড়িতে, সোণার ঝালরযুক্ত সরপোষে ঢাকা কলিকায়, সুগন্ধি অম্বুরী তামাকু সেবন করিতেছিল। পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। মাঝে মাঝে তাহাও পান করিতেছে। ঘড়িতে ঠংঠং করিয়া ছয়টা বাজিল। দাসী আসিয়া বলিল, "মিস্ ডাড্লি।"

"নিয়ে এস।" বলিয়া দত্ত গম্ভীরভাবে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল।

অর্দ্ধমিনিট পরে, নোরা আসিয়া প্রবেশ করিল। দত্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন ও করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে বসাইল। সে কতদিন লণ্ডনে আছে, কোথায় তাহার বাসা, আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে, বিনীত ও মধুরভাবে এই রকম কতকগুলি প্রশ্ন তাহাকে করিতে লাগিল। তারপর নিজ পরিচয় এইরূপ দিল—

"আমার পিতা, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বাল্যকালেই আমাকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি ইংলণ্ডেই ছিলাম। পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া যাই। আমিই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গদি পাইয়া আমি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলাম। রাজ্যটি ছোট। আয় তেমন বেশী নয়—বার্ষিক মাত্র চৌদ্দ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি। একদিন আমি মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছি, একটা গ্রামের মাতব্বর প্রজা আসিয়া এক টুকরা সবুজ পাথর আমার হাতে দিল। বলিল নিজ ক্ষেত চষিতে চষিতে মাটির ভিতর সে উহা পাইয়াছে। পাথরখানা দেখিয়া আমার মনে বড় সন্দেহ হইল। যাচাই জন্য উহা বোম্বাইয়ের কোন বিখ্যাত মণিকারের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা বলিল, উহা উচ্চ অঙ্গের পান্না—তোমরা যাহাকে এমারেল্ড্ বল। ঐটুকু পাথরের মূল্য তাহারা ছয় হাজার টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিল। ছয় হাজার—অর্থাৎ এদেশের টাকায় প্রায় চারিশত পাউণ্ড। তারপর সেইস্থান ও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি আমি খনন করাইতে আরম্ভ করিলাম। আরও তিন টুকরা পান্না পাইলাম। আমার রাজ্যে যে পান্নার খনি আছে তাহা কেহ জানিত না। এখন বুঝিলাম, এই জন্যই পুরাকাল হইতে ইহার নাম হইয়াছে পান্নাগড়। যাহা হউক সে সমস্ত জমি প্রজার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া, স্থানটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছি, একশো গজ অন্তর এক এক জন সশস্ত্র প্রহরী খাড়া আছে। যদি কোনও ধনী ব্যক্তি বা কোম্পানী ঐ পান্নার খনি লীজ লয়, সেই চেষ্টা করিতে এখন আমি ইংলণ্ডে

আসিয়াছি। দুই একজন ধনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আমি বার্ষিক বিশ হাজার পাউণ্ড হিসাবে ভাড়া চাহি ; কিন্তু এখনও দশ বারো হাজারের অধিক কেহ উঠিতে চাহিতেছে না। সেই সূত্রে অনেক চিঠিপত্র লেখার আমার প্রয়োজন হইবে। তাই টাইপ্‌রাইটিং জন্য আমার একজন লোক প্রয়োজন। তা, তুমি যদি এ কর্ম্মটি গ্রহণ কর তবে ভালই হয়।"

নোরা বলিল, "গ্রহণ করিব বৈকি। সেই জন্যই ত আসিয়াছি। কবে হইতে আমায় কার্য্য করিতে হইবে, বলুন।"

"আজ হইতেই তোমাকে আমি নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত আছি। কাল তুমি আসিলে, কতকগুলা চিঠি টাইপ করিতে দিব। তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে। সারাদিন ব্যাঙ্কে খাটিয়াছ, আহা ছেলেমানুষ তুমি, ফুলের মত অমন যে তোমার মুখ-খানি, তাহাও শুকাইয়া গিয়াছে। কিছু খাইবে ?"

নোরা বলিল, "না, ধন্যবাদ, আমি বাড়ী গিয়া খাইব।"

"কিছু পান কর তবে। একটু শ্যাম্পেন, দু'খানা বিস্কুট ! দেখ, আমাদের ভারতবর্ষের নিয়ম এই, বাড়ীতে কোনও অতিথি আসিলে, তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া আমরা ছাড়ি না।"

নোরা রাজি হইল। দুই গ্লাস শ্যাম্পেন ও খান চারি বিস্কুট খাইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আজ তবে আমি যাইতে পারি ?"

দত্তও দাঁড়াইয়া বলিল, "এখনই যাবে ? আচ্ছা, এই লও, তোমার এক সপ্তাহের বেতন অগ্রিম লইয়া যাও।"—বলিয়া দত্ত চারিটি সভ-

রিন ও চারিটি শিলিং পকেট হইতে বাহির করিয়া নোরার হস্তে দিল। নোরা ধন্যবাদ দিয়া সেগুলি গ্রহণ করিল।

দত্ত বলিল, "যাও যাও, আর দেরী করিও না। তোমার কতই না ক্ষুধা পাইয়াছে—আহা ছেলেমানুষ! এখানে ত কিছু খাইলে না, কাল আবার ঠিক সময় আসিও। বোধ হয় আমাদের বনিবনাও ভালই হইবে। তুমি কিন্তু বেশটি!—খাসাটি!"—বলিয়া, এ বিদ্যায় বৃহস্পতি দত্ত সাহেব, নোরার গালটি টিপিয়া দিল। নোরা রাগিল না; মুচকি হাসিয়া, মাথাটি হেলাইয়া "গুড্ নাইট্" বলিয়া প্রস্থান করিল।

আটটা কুড়ি মিনিটে, হাইড্ পার্কের কোনও নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে সুধাংশুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে স্থির ছিল। তখনও এক ঘণ্টার বেশী বাকি। এদিক ওদিক বেড়াইয়া সময়টা কাটাইয়া, যথাসময়ে নোরা সেই সঙ্কেত স্থানে গিয়া তাহার প্রণয়ী "সিউডা"র সহিত সাক্ষাৎ করিল। নবাব সাহেব ঘটিত সকল কথাই সে সুধাকে বলিল। কেবল তাহার শেষের মন্তব্যটি এবং গাল টিপিয়া দিবার কথাটি গোপন করিয়া গেল।

সুধাংশু জিজ্ঞাসা করিল, "নবাব সাহেবের বয়স কত?"

নোরা তাচ্ছিল্যভাবে বলিল, "বয়স ঢের হইয়াছে।" (দত্ত সাহেবের বয়স ৩২ বৎসর মাত্র)

"দেখিতে কেমন?"

"কদাকার।" (দত্ত সাহেব একজন সুপুরুষ বলিয়া গণ্য)

"কথাবার্ত্তা কিরূপ?"

"কাঠখোট্টার মতন। আবার 'হুকায়' ধুম পান করে! মাগো, কি দুর্গন্ধ! কেমন করিয়া যে তাহার চাকরি করিব জানি না।"

সুধাংশু এ সমস্ত শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। বলিল, "কি করিবে বল; কিছুদিন ত কায কর। বাবার চিঠি ত তোমায় পড়িয়া শুনাইয়াছি। তাঁর ভাবভঙ্গি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হয়ত বা বলিয়া বসিবেন, 'না, এখন বিবাহ করিয়া কায নাই; পাঠ শেষ হইলে, বিবাহ করিয়া দেশে চলিয়া আসিও।' তোমার এই চাকরিটি যদি স্থায়ী হয়, তবে চাই কি, বাবাকে না জানাইয়াও কিছুদিন পরে আমরা বিবাহ করিতে পারি। তোমার উপার্জ্জনে এবং আমার এলাউন্সের টাকায় আমাদের সংসার একরকম চলিয়া যাইতে পারিবে। এই সকল ভাবিয়াই, তোমার এ চাকরি গ্রহণে আমি সম্মতি দিয়াছি; নচেৎ বাবার নিকট হইতে আশাপূর্ণ পত্র আসিলে, কথনই সম্মতি দিতাম না।"

৫

দুই সপ্তাহ পরে একদিন দত্ত আসিয়া সত্যবাবুকে বলিল, "ভাই, পাঁচশো টাকা দাও।"

"কেন?"

"ছুঁড়ির জন্যে একটা ইভনিং ড্রেস (পোষাক) কিনতে হবে।"

"সেদিন ত দুশো টাকার ইয়ারিং কিনে দিলে, আবার এখনি?"

দত্ত বলিল, "এইবার যে এই নাট্যরঙ্গে শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠছে। হপ্তাখানেক মধ্যেই নির্ব্বিবাদে ছেলেকে নিয়ে তুমি জাহাজে চড়বে।"

"কি রকম? এত শীঘ্র হবে মনে কর?"

"হবে। শোননা বলি। কাল আমার বাসায়, দু'জনে শ্যাম্পেন ডিনার খেয়ে, সোফায় হেলান দিয়ে বসে গল্প করছি আর ব্রাণ্ডি টানছি, কথায় কথায় ছুঁড়ি বল্লে—'নোবি'—নবাবকে সংক্ষিপ্ত করে' নিয়ে, সে আমার নাম রেখেছে 'নোবি' কিনা!—বল্লে 'নোবি! আমার ইচ্ছা করে, তোমাতে আমাতে দুজনে একদিন কোনও থিয়েটারে যাই!'—বল্লাম, 'বেশ ত! চলনা, যেদিন ব'লবে। অ্যাপলো থিয়েটারে 'থ্রী লিট্‌ল মেড্‌স' হচ্চে—ভারি মজার ব্যাপার, কালই চল,—বল ত এখনই টেলিফোনে বক্স রিজার্ভ করে রাখি!'—ছুঁড়ি বল্লে, 'কাল কি করে যাওয়া হতে পারে? —কি পরে' আমি যাব? তোমার সঙ্গে রোল্‌স্ রয়েস্ কার থেকে থিয়েটারে নামবো কি এই ঝিয়ের পোষাক পরে'?' আমি বল্লাম, 'ওঃ—সেইজন্যে? তা চলনা কালই তিন দিনের কড়ারে বণ্ড্ ষ্ট্রীটে তোমার পোষাক ফরমাস দেওয়া যাক। শনিবার দিন সেই পোষাকে তুমি আমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে পারবে।'— তাই ভাই কাল পোষাকটি ফরমাস দিতে হবে, টাকা দাও।"

সত্যবাবু বলিলেন, "তা দিচ্ছি, কিন্তু একহপ্তা পরে, ছেলে নিয়ে বাড়ী যাব তুমি কি বলছ?"

দত্ত বলিল, "শোন তবে, আমার প্ল্যান বলি। এবার তোমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ছেলের সঙ্গে গিয়ে কাল দেখা কর' যেন আজই এসে পৌছেচ। শনিবারে আমি যে থিয়েটারে যাব, তুমিও ছেলেকে নিয়ে সেই রাত্রে ঐ থিয়েটারে যেও। দিনের

বেলা ছেলেকে বোলো, চলনা থিয়েটার দেখে আসা যাক ! বলে', একখানা খবরের কাগজ তুলে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখে, অ্যাপলো থিয়েটারের নাম করে দেবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "ওঃ বুঝেছি তোমার মৎলব। যাতে সুধা তোমাদের দুজনকে একত্র দেখতে পায়।"

"ঠিক তাই। আমরা দুজনেই বেশ গোলাপী চোখে বক্সে বসে' থাকবো, আর, এদেশে যাকে lovey dovey বলে, সেই রকম, জোটের পায়রা দুটির মত আচরণ করবো।"

সত্যবাবু বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু ছেলে বেটা যদি তাই দেখে ক্ষেপে ওঠে—একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে ?"

দত্ত বলিল, "যদি ছুটে গিয়ে, ছুঁড়ির গলায় হাত দিয়ে গর্জ্জন করে' ওঠে—'রোহিণি !—আমি তোমার যম !'—এই ভয় করছ তুমি ?"

"হ্যাঁ, ঐ রকম।"

দত্ত, সত্যবাবুর বাহুতে করাঘাত করিয়া বলিল, "কোনও চিন্তা নেই দাদা ! এ প্রসাদপুরের মাঠ নয়—এখানে গোবিন্দলালের অভিনয় করবার চেষ্টা করলেই, লণ্ডন-পুলিস অমনি মজাটি দেখিয়ে দেবে বাছাধনকে !"

প্রচুর পরিমাণে হুইস্কি টানিয়া, চেক লইয়া দত্ত প্রস্থান করিল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় হাইড্‌পার্কে নোরার সঙ্গে দেখা হইলে সুধা বলিল, "নোরা, মস্ত খবর। গত্যকল্য বাবা হঠাৎ লণ্ডনে পৌছিয়াছেন ; আজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, "সে মেয়েটিকে একবার নিজের চক্ষে

না দেখিয়া কি করিয়া তোমাদের বিবাহ অনুমোদন করি বল? তাই চলিয়া আসিলাম।'—কাল কখন তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করিবে বল দেখি?"

নোরা বলিল, "তাই ত প্রিয়তম,—বড় মুস্কিল হইল যে! নটিং-হাম হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমার খুড়া অত্যন্ত পীড়িত। তাই কাল শনিবার আপিসের পর ২টার গাড়ীতে আমি নটিংহাম যাইব স্থির করিয়াছি। খুড়াকে দুই দিন একটু সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসি, উইলে আমায় কিছু দিয়াও যাইতে পারেন।"

"কবে ফিরিবে?"

"সোমবার প্রাতে আসিয়া আবার আপিস করিব। শনি রবি এই দুইটি দিন কেবল তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ।"

"আচ্ছা, যদি না গেলেই নয়, তবে যাইও। সোমবারে এইখানে আবার দেখা হইবে ত?"

"হ্যাঁ, তা হইবে বৈকি। 'পাপা'র সঙ্গে দেখা করা সম্বন্ধে, সোমবারেই তোমাতে আমাতে পরামর্শ হইবে।"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিল। পার্কের দর্শকগণের সঙ্গে ইঁহারাও [illegible] থাকে, সেই দিকের অগ্নিবাসে আসিয়া সুধা বলিল, "বাবা, এইখানে একটু দাঁড়ান, [illegible] আসছি।"—বলিয়া সে রাস্তার ধারে নামিল।

ঐ অদূরে পেভ্‌মেণ্টের উপর, কারের অপেক্ষায় নবাব সাহেবের বাহু অবলম্বনে নোরা দাঁড়াইয়া। সুধা হন্ হন্ করিয়া তথায় গিয়া, উত্তেজিত ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "নোরা, নটিংহাম যে

সহিত ভোজনে বসিল। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্রেই সে, 'বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' 'বড় ঘুম পাইতেছে' ইত্যাদি অছিলায় হাইড্‌পার্কে সুধার নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিয়া, নিজ বাসায় ফিরিবার নাম করিয়া এইখানে আসিয়া রাজভোগে পানাহার করে, এবং কথায় বার্ত্তায় অধিক রাত্রি হইয়া গেলে, সব দিন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াও ঘটে না।

শনিবার দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সত্যবাবু পুত্রের নিকট থিয়েটারে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সুধা ভাবিতেছিল, নোরা সহরে নাই, কেমন করিয়া আজ সন্ধ্যা কাটিবে! পিতার এ প্রস্তাবে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

যথাকালে সত্যবাবু, পুত্রসহ অ্যাপলো থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধগিনি মূল্যের এক একখানি টিকিট ও ছয় পেনি মূল্যের একখানি প্রোগ্রাম কিনিয়া ষ্টলে গিয়া তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন। ১৫।২০ মিনিট পরে, অভিনয় আরম্ভ জন্য আলোক নির্ব্বাপিত হইল। প্রায় সেই সময়েই, দ্বিতলের চার-গিনি বক্সখানিতে, কাহারা প্রবেশ করিল, সুধাংশু ভাল দেখিতে পাইল না।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে, সুধাং[illegible] লইয়া দ[illegible] প্রস্থান করিল।

[illegible] সন্ধ্যায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় হাইড্‌পার্কে নোরার সঙ্গে দেখা হইলে সুধা বলিল, "নোরা, মস্ত খবর। গত্যকল্য বাবা হঠাৎ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন; আজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, "সে মেয়েটিকে একবার নিজের চক্ষে

পারিল, ঐ তরুণী ত আর কেহ নয়, তাহারই সাধের প্রণয়িনী নোরা!

দেখিয়া, সুধার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বলিল, "বাবা, বড় গরম, আমি বাইরে থেকে আসি।"—বলিয়া থিয়েটারের বার্-এ গিয়া, এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি লইয়া, চোঁচোঁ করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

ফিরিয়া আসিয়া সে আবার পিতার পার্শ্বে বসিল, কিন্তু অভিনয়ের এক অক্ষরও আর তাহার কাণে গেল না। আলো জ্বলিলেই, সেই বক্সের পানে আবার চাহিয়া রহিল। দুইজনে হাসি গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সোহাগে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে—রীতিমত "লভি ডভি" অবস্থা! সত্যবাবুও মাঝে মঝে আড়চোখে সেই বক্সের পানে চাহিতেছিলেন। সুধাংশু কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। সত্যবাবু বলিলেন, "তোমার কি শরীর ভাল নেই, অসুখ করছে? বাড়ী যাবে?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

রাত্রি ক্রমে ১১টা বাজিল, অভিনয় শেষ হইল। অন্যান্য দর্শকগণের সঙ্গে ইহারাও পিতাপুত্রে বাহির হইল। ভেষ্টিবুলে আসিয়া সুধা বলিল, "বাবা, এইখানে একটু দাঁড়ান, আমি শীগ্গির আসছি।"—বলিয়া সে রাস্তার ধারে নামিল।

ঐ অদূরে পেভ্মেণ্টের উপর, কারের অপেক্ষায় নবাব সাহেবের বাহু অবলম্বনে নোরা দাঁড়াইয়া। সুধা হন্ হন্ করিয়া তথায় গিয়া, উত্তেজিত ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "নোরা, নটিংহাম যে

লণ্ডনের এত কাছে তাহা জানিতাম না। কখন ফিরিলে? খুড়াটি কেমন আছে বল দেখি!"

নোরা মহা বিপদে পড়িল। পান্নাগড়ের রাণী হইবার আশাও সে মনে পোষণ করে; কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না বলিয়া, সুধাংশুকে সে হাতছাড়া করে নাই। এখন একূল ওকুল দুই কুল যাইবার দাখিল। সুতরাং সে নবাব-কুল বজায় রাখিবার আশায়, মস্তক উত্তোলন করিয়া উদ্ধত স্বরে বলিল, "Sir! I don't know you." (মহাশয়, আমি আপনাকে চিনি না।)

সুধা ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "বটে! কবে থেকে, প্রেয়সী?"

নবাব সহেব বলিয়া উঠিলেন, "How dare you insult the future Ranee of Pannagarh!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণমূলে ধাঁ করিয়া এক ঘুষি!

ঘুষি খাইয়া সুধা ঠিকরাইয়া কয়েক পা হটিয়া গেল। আহত স্থানে হাত দিয়া, পুলিস পুলিস বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পথচারী দুই চারিজন লোক, গোড়া হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রকাশ্যভাবে একজন মহিলার এই অপমানে তাহারা আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল, "Serve you right, young man!" গোলমাল শুনিয়া, একজন পুলিস কনষ্টেবলও ছুটিয়া আসিল। লোকের নিকট ব্যাপার অবগত হইয়া, সুধার স্কন্ধে তাহার সেই স্থূল হস্ত অর্পণ করিয়া বলিল, "Off with you drunken nigger. Think twice, before you insult

an English lady again."—(হট্ যাও মাতাল কালা আদমি! ভবিষ্যতে একজন ইংরাজ রমণীকে অপমান করিবার আগে, বেশ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিও।)—বলিয়া সুধাংশুকে এক ধাক্কা দিল।

সত্যবাবু নিকটেই ছিলেন। পুত্রকে লইয়া তাড়াতাড়ি ক্যাবে তুলিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে, নোরার বিশ্বাসঘাতকতার কথা পিতাকে বলিতে বলিতে, সুধা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। একে কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী সন্তান, তার উপর মদের নেশা!

সত্যবাবু পুত্রকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ওদিকে রোলস্ রয়েস্ কারে বসিয়া "নবাব" নেকু সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে, প্রিয়তমে?"

নোরা বলিল, "কে জানে কে! একদিন আমাদের ব্যাঙ্কে এক-খানা চেক ভাঙ্গাইতে গিয়াছিল, সেই সময় আমি উহাকে একটু সাহায্য করি। সেই অবধি ও আমার পিছু লইয়াছে, নানাভাবে আমায় জ্বালাতন করে।"

"তাই নাকি? বদমাস্! এবার বোধ হয় উহার শিক্ষা হইবে।"

"হওয়া ত উচিত।"—বলিয়া নোরা নীরব হইল।

পরদিন রবিবার। সত্যবাবু পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, তুমি মনে বড়ই আঘাত পেয়েছ। আমি বলি কি আমার সঙ্গে দেশে চল। সেখানে কিছুদিন থাকলে, তোমার মনটা আবার সুস্থ হবে।"

সুধাংশু সহজেই সম্মত হইল। সোমবার প্রাতে পিতাপুত্রে

টমাস কুকের বাড়ী গিয়া জানিলেন, অদ্য রাত্রে লণ্ডন হইতে ট্রেন ছাড়িলে, মার্সেল্‌স্‌ বন্দরে ভারতগামী একখানি ফরাসী জাহাজ ধরা যাইবে। সত্যবাবু দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া আনিলেন।

অবসর মত সত্যবাবু দত্তসাহেবের সহিতও দেখা করিলেন, তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন; টাকাকড়িও বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আহা, ছেলেটাকে অমন করে' ঘুষি মারাটা তোমার ভাল হয়নি কিন্তু।"

দত্ত বলিল, "দাদা, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল নইলে চলবে কেন? ঐ মুষ্টিযোগটুকু না হলে কি আর বাবাজী অমন লক্ষ্মীটির মত তোমার সঙ্গে বাড়ী যেতে রাজি হতেন? ভাল পরামর্শই হয়েছে—আজ রাত্রেই সরে পড়। দেশে গিয়েই, একটি সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বাবাজীর বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর তাকে বিলেত মুখো হ'তে দিও না।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আবার নেড়া বেলতলায় যায়! এখন, তুমি কি করবে বল? কবে দেশে ফিরবে?"

"হপ্তাখানেক পরেই। আসছে মেলে, আমিও আমার রাণীটিকে কদলীপ্রদর্শন ক'রে,—চম্পট পরিপাটি দেবো। আর কি!"

"হাঁ, বেশী দেরী করো না।"—বলিয়া সত্যবাবু উপকারী বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমাপ্ত